Vol. 52 | No. 3 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

‘আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস' : উত্তরাধুনিক পাঠ

Volume	52
Issue	3
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Tashrik-E-Habib
Published online	June 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v52i3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i3.7
Pages	141-165
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

‘আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস’ : উত্তরাধুনিক পাঠ

Check for updates

তাশরিক-ই-হাবিব*

কথাসাহিত্যিক হিসেবে শহীদুল জহির (১৯৫৩-২০০৮) যে নিরীক্ষাপ্রিয় ছিলেন, এর প্রমাণ তাঁর উপন্যাসসমূহে থাকলেও বিভিন্ন ছোটগল্পে তা অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়। প্রথম গল্পগ্রন্থ *পারাপার*-এর (১৯৮৫) পাঁচটি গল্পেই মার্কসীয় বীক্ষা হয়ে উঠেছিল তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। অথচ *ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প* (১৯৯৯) এবং *ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প* (২০০৪) গ্রন্থদ্বয়ে কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব, দর্শন বা ভাবনাকেন্দ্রিক একাধিক গল্প অনুপস্থিত। সময়ের ব্যবধানে তিনি ক্রমশই ছোটগল্পের আধার ও আধেয় সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছিলেন। তাই গতানুগতিকতার পথ পরিহার করে নানারকম নিরীক্ষার প্রবণতা উক্ত দুটি গ্রন্থভুক্ত গল্পসমূহে লক্ষণীয়। এরই সূত্র ধরে তাঁর গল্পভুবনে উত্তরাধুনিক সাহিত্যভাবনার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে শহীদুল জহিরের অভিমত তাঁর প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট।[১] তিনি নিজেই জানিয়েছেন, বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ করে তিনি উত্তরাধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে কে উত্তরাধুনিক গল্প লিখছেন,[২] এ ধারার বৈশিষ্ট্যসমূহ[৩] কী এবং তাঁর নিজের কোনো গল্পকে এর অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না, এ ব্যাপারে তাঁর অভিমতও সাক্ষাৎকারে[৪] বিবৃত। তিনি নিজের লেখা যে গল্পটিকে উত্তরাধুনিক ছোটগল্প[৫] হিসেবে বিবেচনা করেছেন, সেটি হল ‘আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস’। এটি শহীদুল জহিরের ‘বহুল আলোচিত’[৬] অথচ একমাত্র গল্প, যা তিনি নিজেই ইংরেজিতে অনুবাদ[৭] করেছেন।

১

‘আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস’ গল্পটিকে ‘বাংলা ছোটগল্পের বিনির্মিত[৮] নিদর্শন’ হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে। কারণ লেখক এ গল্পে উন্মেষপর্বের বাংলা ছোটগল্পকারদের তো বটেই, এমনকি ‘বাংলা ছোটগল্পের জনক’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প-সম্পর্কিত ভাবনাকেও[৯] সচেতনভাবে পরিহার করেছেন। আখ্যান বিন্যাসের স্বাতন্ত্র্য, বর্ণনাভঙ্গিতে উত্তরাধুনিক কলাকৌশলের সমাবেশ, কুশীলবদের চরিত্রায়ণ, ভাষারীতি ও সংলাপ গ্রন্থনা, দৃষ্টিকোণের অভিনবত্ব, স্থান ও সময়ের ধারণার পরিবর্তন, বদ্ধতা পরিহার করে গল্পের উন্মুক্ত প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তি নির্দেশ, ‘অবযুক্তি’র (Paralogy) প্রয়োগ, অনুচ্ছেদহীনতা ও বিরামচিহ্নের পরিকল্পিত ব্যবহার — প্রভৃতির সম্মিলনে এটি উত্তরাধুনিক বাংলা ছোটগল্পের যোগ্য প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১.১ আখ্যান বিন্যাস

উত্তরাধুনিক সাহিত্যে এরিস্টটলীয় প্লটভাবনা বা কাহিনির পরিবর্তে প্রাধান্য পায় আখ্যান প্রসঙ্গ। বারবারা হার্ডি আখ্যানের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে জানিয়েছেন, 'আখ্যানের মধ্যস্থতায় আমাদের জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা ঘটতে থাকে — স্বপ্ন-দিবাস্বপন, আশা-হতাশা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, স্মরণ, পরিকল্পনা, সংশোধন, সমালোচনা, নির্মাণ, জ্ঞানার্জন, খোশগল্প, ঘৃণা, ভালবাসা' (রণবীর, ২০১১ : বারো)। উত্তরাধুনিক সাহিত্যতাত্ত্বিকদের অন্যতম জ্যা ফ্রাঁসোয়া লিওতার (১৯২৪-১৯৯৮) আখ্যান সম্পর্কে জানিয়েছেন, 'আখ্যান হল জ্ঞানের ধরন। আখ্যানের মাধ্যমে সমাজে জ্ঞান ব্যক্ত ও সঞ্চারিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের বিভিন্ন সম্ভাবনাকে আখ্যান সংজ্ঞাত করে। কোনো গোষ্ঠী বা সমাজের আখ্যানসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা বা না থাকার কারণে স্বদেশী ও বহিরাগত ব্যক্তির মধ্যে তফাত হয়ে যায়।' (সম্রাট, ২০১০ : ৪৬)। উত্তরাধুনিক মতবাদ অনুযায়ী, কেন্দ্রচ্যুতির ঘটনায় আধুনিক সমাজের নানামুখী আখ্যানের উপস্থিতি টের পাওয়া যায় নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনের প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন মাধ্যমে। এভাবে ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে সিনেমা, ভিডিও, বিজ্ঞাপনী টেক্সট, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক সাংবাদিকতা, কার্টুন, ভিডিও গেমস অর্থাৎ পপুলার নাগরিক সংস্কৃতির সমগ্র পরিসরে সাম্প্রতিককালে আখ্যানেরই জয়জয়কার। এছাড়াও ইতিহাস, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি, আইনশাস্ত্র, বিজ্ঞানধর্মী প্রবন্ধ প্রভৃতির মধ্যেও আখ্যানের উপস্থিতি লক্ষণীয়। (রণবীর, ২০১১ : ৮৯) এ গল্পের আখ্যানভাগ পল্লবিত হয়েছে পুরাতন ঢাকার দক্ষিণ মৈশুন্দি এবং এর পার্শ্ববর্তী দোলাইখাল, সূত্রাপুর, নারিন্দা, বাংলাবাজার, জোড়পুল, বনগ্রাম, পদ্মনিধি লেন, ঠাটারিবাজার, রায়সা বাজার, বাদামতলি, শ্যামবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপ্ত স্থানিক পটভূমিতে। এতদঞ্চলের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো, যারা বিশেষভাবেই লেদমেশিনের নাট-বল্টু ও ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ, কাচ, পাউরুটি, বিস্কুট ও লজেন্স প্রভৃতির কারখানার শ্রমিক এবং ইলেকট্রিক সরঞ্জামের দোকানের কর্মচারী হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার শিল্পবিন্যাস হয়ে উঠেছে এ গল্প। এ গল্পের মূল আখ্যানভাগ তাদেরকে ঘিরে আবর্তিত হলেও এর সঙ্গে ঘটনাক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছে নবাবগঞ্জ বা দোহার থেকে আগত আব্দুল গফুর ও তার তিন ছেলেমেয়ের সঙ্গে মহল্লাবাসীর আন্তঃসম্পর্কযুক্ত তিনটি ক্ষুদ্র, পৃথক আখ্যান। মহল্লাবাসীর দৈনন্দিন জীবনসম্পৃক্ত গল্প, গুজব, রটনা, জনশ্রুতিসমূহ এ গল্পের আখ্যানভাগকে ক্রমশ জটিল এবং সম্প্রসারিত করেছে। তরমুজের মত একটি ফলকে ঘিরে মহল্লাবাসীর, বিশেষত গল্পকথকদের ('আমরা') যে বিচিত্র মনোভঙ্গি, এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায় তাদের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের নানা স্মৃতি, কল্পনা, প্রেমাবেগ, কামনা, যৌনতা, বিরহবিধুরতা, একাকিত্ববোধ, সর্বোপরি জীবনের প্রতি দুর্বার আসক্তি। অতি তুচ্ছ বিষয়কে আশ্রয় করে তারা বছরের পর বছর অতিক্রম করে চলে ব্যক্তিগত প্রাপ্তি ও প্রাপ্তিহীনতার হিসাবনিকেশ। সাংসারিক জীবনে সুখী হবার মূলমন্ত্র হিসেবে অর্থের প্রতি আসক্ত না হয়ে বিকেলে বা সন্ধ্যায় অবসরকালে বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে ঠাট্টা, তামাসা, রঙ্গ-ব্যঙ্গসহযোগে আড্ডাবাজিই হয়ে ওঠে তাদের চিত্তবিনোদনের প্রধান অবলম্বন। সমগ্র গল্পেই লেখক এ বিষয়কে উপজীব্য করেছেন মহল্লাবাসীর তরমুজকেন্দ্রিক আখ্যানের সঙ্গে অন্যান্য

আখ্যানের সমাবেশ ঘটিয়ে। কোনো বিশেষ তত্ত্ব, জিজ্ঞাসা, দর্শন বা প্রাজ্ঞ ভাবনা, মহত্তম উপলব্ধিকে লেখক তাদের জীবনে আরোপ করেননি। কেননা, জীবনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিছক বেঁচে থাকার আনন্দ উপভোগের চেষ্টাটুকুই তাদের বিশিষ্ট করে তোলে। এ জীবনে শঠতা, চক্রান্ত, ক্লেদ, রিরংসা, অপমান, গ্লানি, প্রতিযোগিতা, হিংসা, ক্রোধ, পাশবিকতা সবকিছুই রয়েছে। তবু এসবকে নিয়েই পরস্পরের সঙ্গে হাসি, ঠাট্টা, রসিকতা, কৌতুকের আশ্রয়ে জীবনকে উপভোগের চেষ্টার মূল্য যে অসীম, লেখক সেদিকেই যেন পাঠককে আহ্বান জানান। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক ঢাকার যান্ত্রিক মানুষেরা ক্রমশই যে নৈঃসঙ্গ্যের অন্ধকার আবর্তে নিজেকে শৃঙ্খলিত করে, এ গল্পভুক্ত পুরাতন ঢাকার মহল্লাবাসী তার সমান্তরালে দাঁড়িয়ে থাকে জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত রূপকে অবলোকনের দুর্বার আগ্রহে। গল্পটির আখ্যানভাগ বিন্যাসের কৌশলগুলো নিম্নরূপ —

ক. এ গল্পের আখ্যানভাগ স্পষ্টতই রাইজোমিক। আধুনিক উপন্যাসে অনুসৃত গাছের ডালপালা-পাতাসমেত নির্দিষ্ট পরিকাঠামোর ধারণাকে অগ্রাহ্য করে এতে বরং শেকড়ের মত অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ক্ষুদ্র ও মধ্যমাকৃতির আখ্যানের সমাহার লক্ষণীয়। গিলেজ দেল্যুজ ও ফেলিক্স গাত্তারি প্রমুখ উত্তরাধুনিক তাত্ত্বিকগণ রাইজোম রূপকের মাধ্যমে উপন্যাসে বিবৃত রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গসমূহ, কেন্দ্র-প্রান্ত সম্পর্ক, বিভিন্ন সংঘ, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে জনমানুষের সম্পৃক্ততার স্বরূপ নির্দেশে জোর দিয়েছেন। তাঁদের মতে, যেহেতু উত্তরাধুনিক মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রের গ্রন্থিবদ্ধ চিন্তাসূত্র, মূল্যবোধ ও ভাবনারাশি বিকেন্দ্রীভূত, যাযাবর স্বভাবের ও এলোমেলো, তাই তাঁরা আধুনিকতার অনুকরণীয় মডেল হিসেবে জ্ঞানবৃক্ষের বিপরীতে পাশাপাশি অবস্থানরত উত্তরাধিকারবিচ্ছিন্ন অজস্র মডেলের কল্পনা করেছেন, যেগুলো (প্রতিষ্ঠান, সংঘ, রাষ্ট্রের রূপক হিসেবে) পরস্পরের সঙ্গে শেকড়ের মত জড়িয়ে থাকলেও কেউ অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে না। এ গল্পে মূল আখ্যান হিসেবে তরমুজকেন্দ্রিক আখ্যানের পাশাপাশি শেফালি আখতারের আখ্যান, ঝর্ণা বসাক-আজিজুল হকের আখ্যান, আমিনুল হক-পুতুল বেগমের আখ্যান মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। গল্পে মূল আখ্যানের সঙ্গে সহযোগী আখ্যানসমূহের যোগাযোগের মূল সূত্রটি সম্পৃক্ত থাকে প্রেমভাবনাকে অবলম্বনের মাধ্যমে। অর্থাৎ গল্পকথক মহল্লাবাসীর মনোভঙ্গি অনুধাবনে এ তিনটি ক্ষুদ্র আখ্যানের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। তবে মূলের অংশ হলেও এরা গল্পের আখ্যানভাগের পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য বিকল্প নয়, বরং অত্যাবশ্যক ভূমিকাই পালন করে। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা বিবেচনায় রাখতে পারি শেফালি আখতারের আখ্যানকে। শেফালি আবদুল গফুরের একমাত্র মেয়ে। তার প্রতি দক্ষিণ মৈশুন্দি মহল্লার উঠতিবয়সী গল্পকথকরা প্রেমাবেগে আপ্লুত হলেও সে এ ব্যাপারটিকে নিছক উপভোগ করত। তাই একদিন এ মহল্লায় বহিরাগত জনৈক প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে বাড়ি ছেড়ে পালালে ঘটনাটি মেনে নেয়া তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। বলাবাহুল্য, একসময় তারা বয়সের ব্যবধানে পরিপক্বতা অর্জন করায় নিজেদের বালখিল্য আচরণ উপলব্ধিতে সমর্থও হয়। কিন্তু এ ঘটনার অভিঘাত শেফালির বাবার জীবনের পরিণতি নির্দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা মূল আখ্যানেরই অংশ। কেননা তার মৃত্যুর ঘটনা গল্পকথকদের সমন্বিত চেতনালোকে সময়ের ব্যবধানেও জাগ্রত থেকে যায়।

খ. এসব ক্ষুদ্র আখ্যানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, একটি অন্যটির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে না, অথচ এদের সম্মিলনে গল্পের মূল আখ্যানভাগ সম্প্রসারিত হয়। যেমন— শেফালির আখ্যানে জানা যায়, সে একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে হাতে একটি চারাগাছ নিয়ে এসেছিল। সেটি সে বাসায় রোপণ করেছিল কি না সেই তথ্য সম্পর্কে লেখক পাঠককে কিছুই জানান না। এ ঘটনাকে তিনি পরবর্তী পর্যায়ে আমিনুল হক-পুতুল বেগমের আখ্যানের সঙ্গে গ্রথিত করেছেন। মহল্লাবাসীর ধারণা, আমিনুল হক বাড়িসংলগ্ন যে হাস্নাহেনা ঝোপের কাছে মারা যায়, সেটি ছিল শেফালির স্কুল থেকে বাড়িতে আসার সময় সঙ্গে আনা সেই চারাটি। অর্থাৎ ক্ষুদ্র আখ্যানগুলোর পরস্পরের সঙ্গে যোগসাজস এবং সেগুলোকে মূল আখ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে গল্পের আখ্যানভাগকে পূর্ণতা দানের প্রচেষ্টায় লেখক এ কৌশল অনুসরণ করেছেন।

গ. লেখক এ গল্পের নামকরণে 'ইতিহাস' শব্দটি প্রযুক্ত করেছেন বিশেষ অভিপ্রায়ে। অভিধানে এ শব্দের যেসব অর্থ প্রচলিত, সেগুলো হল 'অতীত কথা', 'প্রাচীন কাহিনী', 'পূর্ব-বৃত্তান্ত'। (এনামুল ও অন্যান্য, ২০০৭ : ১৩৯)। লক্ষণীয়, এসব অর্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে সমষ্টিমানুষের আলাপচারিতার প্রসঙ্গ। এ গল্পে লেখক সচেতনভাবেই 'ইতিহাস' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। তিনি পুরাতন ঢাকার দক্ষিণ মৈশুন্দির যে রূপরেখা তুলে ধরতে চান, সেই জনপদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যৌথজীবনের অবিরাম মিথস্ক্রিয়া। সেখানে ব্যক্তি বরাবর সমষ্টির অন্তর্গত বলেই কখনো কখনো তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলোও অন্যের জানাজানির মাধ্যমে কদর্য রূপ ধারণ করে। তবু, আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের যূথবদ্ধ স্বভাব যে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এযুগের মানুষও বহন করে চলে, তারই নজির লক্ষণীয় এ মহল্লার বাসিন্দাদের আচরণে। সেকারণেই পারস্পরিক লেনদেন, জীবিকা, বন্ধুত্ব, আড্ডাবাজির সূত্রে তারা প্রতিনিয়তই যৌথ আচরণের অংশীদার হয়ে ওঠে। লেখক এ গল্পে সচেতনভাবে দুইবার 'গল্প' শব্দও ব্যবহার করেছেন। দুটি ভিন্ন গল্প তরমুজসম্পৃক্ত আখ্যানের সঙ্গে যুক্ত, যার একটি মহল্লার যুবক মামুনের সঙ্গে ঐ মহল্লার তরমুজ বিক্রেতার বাদানুবাদ-সংশ্লিষ্ট, অন্যটি জনৈক তরমুজ চাষীর অশ্লীল আচরণসূচক। অর্থাৎ মহল্লাবাসীর যৌথজীবনের ব্যাপ্তি নির্দেশে লেখক কৌশলে এ দুটি গল্পকে আশ্রয় করেছেন, যেখানে সত্যমিথ্যা, যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে কোনো ব্যাপার যাচাই বাছাইয়ের চেয়ে একের প্রতি অন্যের বিশ্বাস, আস্থা ও নির্ভরতার মূল্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। লেখক সম্ভবত গল্পদুটির গল্পত্বকেই গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন, যা গল্পকথকদের বয়ানে এক বা একাধিক শ্রোতার উদ্দেশ্যে পরিবেশিত হয় নির্মল আনন্দ ও হাস্য-পরিহাস, কৌতুক বা লঘু বিনোদন সঞ্চারের জন্য। বাংলা ছোটগল্পের প্রচলিত রীতি মেনে আদি-মধ্য-অন্ত বিস্তৃত কাহিনিকে পল্লবিত করার অভিপ্রায় এ গল্পে লেখকের ছিল না। কারণ উত্তরাধুনিক ছোটগল্পে একাধিক ছোট বা মাঝারি আখ্যান সহযোগে গল্পটি পূর্ণাঙ্গ অবয়ব লাভ করে। লিওতার মহাআখ্যানকে অস্বীকার করে ক্ষুদ্রাকৃতির ও স্থানীয় আখ্যানসমূহের সমাহারকে গুরুত্ব দিয়েছেন। 'গল্প', 'কাহিনি', 'কথা', 'বৃত্তান্ত' প্রভৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলো সমষ্টিমানুষের মুখে মুখে প্রচলিত রচনা, যার বিস্তার ঘটে চলে যুগ যুগ ধরে। কোনো জনসমাবেশে বা আড্ডায় একটা গল্প শেষ হলে যে কারো বয়ানে আরেকটি গল্প বলার পালা

শুরু হয়ে যায়। এসব গল্পের ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল ও লঘুভঙ্গির; সর্বোপরি শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে পারস্পরিক সংযোগও গল্প শুরু করা মাত্রই ঘটে যায়। এসব বৈশিষ্ট্যও এ গল্পভুক্ত আখ্যানসমূহে লক্ষণীয়।

ঘ. এ গল্পের অন্তর্গত আখ্যানসমূহে ঠাসবুনোটের জমাট রূপ অনুপস্থিত। মোটাদাগে কিছু ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়ে তিনি এসব আখ্যানের অবয়ব নির্মাণ করেছেন অনেকটাই রেখাচিত্রধর্মী ভঙ্গিতে। কুশীলবদের পরিচয় থেকে শুরু করে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন বিভিন্ন দৃশ্যে কিছুটা আভাসিত হলেও একধরনের অস্পষ্টতা ও হেয়ালি তাদের ভাবমূর্তিতে ফুটে ওঠে। যেমন— গল্পকথকদের নাম, তাদের দৈহিক বর্ণনা বা পারিবারিক বৃত্তান্ত প্রভৃতি প্রসঙ্গে লেখক যথাসম্ভব নীরব থাকলেও তরমুজের প্রতি তাদের আগ্রহ-সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গসমূহ উপস্থাপনে তিনি যথেষ্ট সরব। আবার, আজিজুল হক ননী বসাকের উদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরী মেয়ে ও সিনেমার নায়িকা ঝর্ণা বসাকের প্রেমে পড়ে অবশেষে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পাগলাগারদে অবস্থান করতে বাধ্য হলেও এ প্রসঙ্গে সেই নারীর মনোভঙ্গি সমগ্র গল্পেই অনুপস্থিত। শুধু তাই নয়, তার প্রতি গল্পকথকদের কামনাযুক্ত বিমুগ্ধতা এবং একপর্যায়ে রূঢ় বাস্তবতাকে তাদের মেনে নিতে বাধ্য হওয়ার বৃত্তান্ত ঝর্ণা বসাকের চেতনালোকে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, লেখক তা জানান না। লেখকের সংযম ও নীরবতা প্রতিটি আখ্যানেই লক্ষণীয়, যার মাধ্যমে তিনি পাঠকের জন্য স্বাধীনভাবে বিষয়গুলো অনুধাবন করার সুযোগ উন্মুক্ত রাখেন।

ঙ. এ গল্পের আখ্যানবিন্যাসের প্রয়োজনে সহায়ক ঘটনাসমূহকে লঘু ও হালকা মেজাজে উপস্থাপনের জন্য লেখক জনশ্রুতি[১০] গল্প-গুজব, রটনার আশ্রয় নিয়েছেন। এসব কখনো বা গল্পকথকদের ভাষ্যে কথিত, কখনো বা অন্য চরিত্রের সংলাপে প্রযুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে কখনো কখনো একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পৃক্ততায় এর প্রামাণিকতাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। সমষ্টিমানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংশয়, মনতুষ্টি ও পরিতৃপ্তিলাভের সঙ্গে যুক্ত বলে এসব উপাদান তাদের আচরণে বহুকাল ধরেই প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। গুজব-রটনা কোনো বিষয়, ব্যক্তি, ঘটনাকে ভিত্তি করে মানুষের মুখে মুখে খুব দ্রুত পল্লবিত হয় এবং এর পেছনে যুক্তির সক্রিয় ভূমিকা প্রায়শ অনুপস্থিত। তবু জনে জনে প্রচারিত হলে সেটিই একসময় জনশ্রুতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তাই আখ্যানের গ্রন্থনায় এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ গল্পে হাজি আব্দুর রশিদ অসুস্থ অবস্থায় যে তরমুজ সম্পর্কেই ভাবে এবং সেজ ছেলে আব্দুল জলিলের জন্য কৌটায় তরমুজ বাজারজাতকরণের কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করে, এটি গল্পকথকদের নিছক অনুমান, যার পেছনে সমর্থনযোগ্য প্রামাণ্য তথ্য নেই। তার লজেন্সের কারখানা রয়েছে। সেকারণেই এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তার যে প্রতিবেশী রহিমা বিবির দেড় কাঠা আয়তনের বাড়িটিই দরকার, এটি নিছকই গুজব। রহিমা বিবি সম্ভবত নিঃসঙ্গ বিধবা বৃদ্ধা বলেই একদিন বোনের ছেলে আব্দুল গফুরকে পরিবারসহ আনিয়ে তার নামে বাড়ি ও জমির মালিকানা লিখে দেয়। এ ঘটনাকে গল্পকথকেরা ও মহল্লাবাসী গুজব-রটনাযোগে উপস্থাপন করে। কেননা, হাজি আব্দুর রশিদ মৃত্যুর পূর্বে তরমুজ খেতে না পারার বেদনাকে ভুলে থাকতে তার বড় ছেলেকে নির্দেশ দিয়ে যায় তরমুজকে কৌটায় বাজারজাতকরণের ব্যবসা

শুরুর জন্য এবং এভাবেই তার অন্তিম অভিলাষ বাস্তবে রূপান্তরিত হয় মহল্লায় 'হাজি ফুড প্রডাক্ট কোম্পানি' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে, যা গল্পের শেষাংশে বিবৃত। এ বৃত্তান্ত গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খণ্ডখণ্ডভাবে লেখক এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে, সচেতনভাবে লক্ষ না করলে গুজব হিসেবে প্রচলিত ঘটনাকেই প্রকৃত সত্য বলে ভ্রম হবে। সেটি যে গল্পকথকদের ক্ষেত্রে ঘটেছে, তা এ গল্পের সচেতন পাঠকের উপলব্ধিতে প্রতীয়মান হয়। এ গল্পের আমিনুল হক-পুতুল বেগম আখ্যান নির্মাণে জনশ্রুতির যে ভূমিকা, তা পরবর্তী পর্যায়ে মূল আখ্যানেও সম্প্রসারিত হয়েছে। বাঁশির সুর শুনে এবং হাস্নাহেনা ফুলের গন্ধে মোহিত হয়ে সাপ আসে, এরূপ লোকবিশ্বাস বহুদিন থেকেই বাঙালি জনসমাজে প্রচলিত। আমিনুল হক পাকা বাঁশিবাদক, তার বাঁশির সুর মহল্লার গল্পকথকেরা শুধু নয়, তাদের স্ত্রীরাও আনমনা হয়ে শোনে। জাদুকরী সুরমূর্ছনায় সে শ্রোতাদের বিমুগ্ধ করতে সমর্থ ছিল। পুতুলও এর ব্যতিক্রম নয়। অন্যদিকে পুতুলের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে আমিনুলও তার প্রেমে পড়ে। এক রাতে সাপের দংশনে আমিনুলের মৃত্যুর ঘটনাকে মহল্লাবাসী বিবেচনা করে অলীক গালগল্প সহযোগে। সাপকেন্দ্রিক সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে এ জনশ্রুতির উদ্ভব ঘটায় যে, সাপিনীরা পুরুষ প্রেমিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তদুপরি আমিনুল যেহেতু বাঁশি বাজাতে পারঙ্গম ছিল, তাই একটি সাপিনী তার প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু সাপিনীরা যেহেতু প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীকে সহ্য করে না, তাই আমিনুলকে এরই দংশনে মরতে হয়। এ জনশ্রুতির অন্তরালে রয়েছে তাদের 'নাগিনীর প্রেম', বেহুলা' প্রভৃতি সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা। জনগণের মনোরঞ্জনার্থে অতিলৌকিক, কাল্পনিক বিভিন্ন ঘটনাকে সিনেমায় রূপদান করা হলেও এর প্রভাব যে সমষ্টিচেতনায় বিচিত্র অভিঘাত সৃষ্টি করে, এ আখ্যান তারই প্রতিনিধিত্ববহ। লেখক মহল্লাবাসীর মানসিক গড়নের স্বরূপ নির্দেশ প্রসঙ্গে এ জনশ্রুতিকে মূল আখ্যানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন।

১.২ বর্ণনাভঙ্গি

এ গল্পের বর্ণনাভঙ্গি জটিল, এলোমেলো এবং পরিস্থিতিসাপেক্ষে অনুপুঙ্খ তথ্যাদির সমাবেশে আবৃত। পুরাতন ঢাকার দক্ষিণ মৈশুন্দি মহল্লার জনজীবনের সামগ্রিক রূপরেখাকে উপস্থাপনের প্রচেষ্টায় লেখক মহল্লার গলি, রাস্তা, দালানকোঠা, মসজিদ, মন্দির, দোকানপাট, বাসিন্দা, তাদের স্থানিক ভাষা, স্বরভঙ্গি প্রভৃতির সমন্বয়ে বহমান সংস্কৃতির বিভিন্ন দিককে উপস্থাপনের সমান্তরালে তাদের চেতনালোকের বিশিষ্ট অবয়বকেও ধরতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে সমষ্টিমানুষের বিচরণস্থল হিসেবে পারিপার্শ্বিক সামাজিক প্রতিবেশের সমান্তরালে তাদের অন্তর্লৌকিক বাস্তবতার ভাষিক বিন্যাসে কোনোভাবেই প্রচলিত, সরল ধরনের বর্ণনাভঙ্গিকে অবলম্বন সম্ভব ছিল না। পাশাপাশি, যেহেতু সমষ্টিমানুষেরা একত্রে তাদের অবচেতনলোকে পুঞ্জীভূত বিভিন্ন ঘটনা, চরিত্র ও বিষয়বস্তুকে স্মৃতিচারণার মাধ্যমে পাঠকের নিকট উপস্থাপন করছে, সেকারণে এসবের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হওয়া অসম্ভব। ফলে বিবিধ ঘটনার একের মধ্যে অন্যটির হরদম অনুপ্রবেশ এবং আগের ঘটনার সঙ্গে পরের ঘটনার পারম্পর্য রক্ষার পরিবর্তে উল্লম্ফনের স্বেচ্ছাচার, টুকরো টুকরো দৃশ্যের যথেচ্ছ সমন্বয়, চরিত্রসমূহের অবিরাম অবস্থান পরিবর্তন, সময় ও স্থানের লাগামহীন পরিবর্তন — প্রভৃতির পরিণতিতে পুরো বর্ণনাভঙ্গি যে চেহারা পেয়েছে, সেটিকে তুলনা

করা যেতে পারে একটি আয়নার ভাঙা টুকরোগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে সেগুলো পুনরায় জোড়াতালি দেয়ার প্রচেষ্টার সঙ্গে। তদুপরি গল্পের বর্ণনাভঙ্গিতে নতুনত্ব সংযোজনার্থে লেখক মাত্র একটি অনুচ্ছেদবিশিষ্ট একটি পূর্ণ বাক্যে বিভিন্ন বিরামচিহ্নের (৬১৩টি কমা, ১০২টি সেমিকোলন, ৭টি উদ্ধরণ চিহ্ন, ৬টি প্রশ্নবোধক চিহ্ন, ৫টি বিস্ময়সূচক চিহ্ন এবং ১টি কোলন) ধারাবাহিক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। উত্তরাধুনিক সাহিত্যকর্মে গৃহীত বর্ণনাভঙ্গির বিশেষ কিছু কৌশল এ গল্পেও প্রযুক্ত হয়েছে। যথা—

ক. পেস্টিচ বা সমন্বয় : পেস্টিচ বলতে পূর্ববর্তী কোনো সাহিত্য বা শিল্প থেকে ভাবনা, ধারণা, বিষয় বা রীতিকে গ্রহণ করে রচিত সৃষ্টিকর্মকে বোঝালেও (Zillur, 2002 : 547) উত্তরাধুনিক ভাবনায় ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। হুবহু অনুকরণের পরিবর্তে নতুন কিছু সংযোজনের প্রচেষ্টা এতে ভিন্ন মাত্রা এনে দেয়। সেটি হতে পারে প্যারোডি, পাঁচমিশালি সঙ্গীত, ছড়া, পুরাণ, রূপকথা, গোয়েন্দা কাহিনি বা ভৌতিক কাহিনি, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি প্রভৃতি। এ গল্পে মহল্লার উঠতিবয়সী গল্পকথকদের যৌনচেতনার স্বরূপ নির্দেশ প্রসঙ্গে লেখক 'অ্যান্ড হোয়েন শি ওয়াজ গুড' সিনেমাকে অবলম্বন করেছেন। বয়ঃপ্রাপ্তির ফলে দাঁড়ি-গোঁফ কামানোর অন্তর্তাগিদ এবং বিষয়টি আয়ত্ত করতে এ সিনেমা দেখে অনুপ্রাণিত হওয়ার প্রবণতা তাদের আচরণে লক্ষণীয়। নিছক চিত্ত বিনোদনের জন্যই তারা এর প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। অথচ এ অভিজ্ঞতা তাদের এতটাই প্রভাবিত করে যে, তারা দাঁড়ি-গোঁফ কামানোর অনুশীলন হিসেবে তরমুজে মহড়া দেয় এবং এ কাজে ক্রমশই হাত পাকায়।

খ. ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি বা আন্তঃপাঠ : এ রীতি (সালাহউদ্দিন, ১৯৯৯ : ১৪৪; রণবীর, ২০১১ : ৬৯-৭০, ১০৯-১১০) নির্দেশ করে একটি রচনার সঙ্গে এর পূর্বে রচিত আরেকটি বা একাধিক রচনার পারস্পরিক যোগাযোগ, প্রভাব, ঘনিষ্ঠতা বা যে কোনো ধরনের সম্পৃক্ততাকে। কেননা, উত্তরাধুনিক ধারণা অনুযায়ী কোনো রচনাই একক বা স্বয়ম্ভূ নয়। পূর্ববর্তী কোনো রচনার বীজকে পরবর্তী রচনা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ধারণ করে। একজন লেখক অন্য কোনো লেখকের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন এবং সেকারণেই দুটি ভিন্ন রচনার মধ্যেও এ সূত্রে চিন্তা, ভঙ্গি বা বিষয়গত সাদৃশ্য থাকতে পারে। এ গল্পে ঝর্ণা বসাকের প্রতি প্রেমের উপলব্ধিতে আজিজুল হকের কবিতা লেখার বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে গল্পকথকদের ভাবনায়। তারা ভেবেছিল যে আজিজুল হক হয়ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে' অথবা কাজী নজরুল ইসলামের 'ভোর হল দোর খোল' ধরনের শিশুতোষ কবিতা লেখে। অন্যদিকে, কফিলুদ্দিন ব্যাপারি নতুন বিস্কুটের কারখানার যাত্রা শুরু হয় মহল্লাবাসীর উপস্থিতিতে 'ইয়ানবি সালামালাইকা' আবৃত্তি সহযোগে মিলাদ পড়িয়ে প্রথমবার বানানো বিস্কুট সকলকে বিতরণের মাধ্যমে। আবার, একপর্যায়ে বাজারে নিত্যপণ্যের মূল্য বেড়ে গেলে অধিক দামে তরমুজ কিনতে বাধ্য গল্পকথকেরা এর কারণ জানতে শরণাপন্ন হয় 'ইত্তেফাক' পত্রিকার। এতে প্রকাশিত প্রতিবেদন পড়ে তারা সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হয়। অর্থাৎ তাদের প্রাত্যহিক জীবনাচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ধর্মীয়, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বা নন্দনভাবনা, সংস্কৃতি-সংশ্লিষ্ট পাঠ সবকিছুই আন্তঃপাঠের দৃষ্টান্ত।

গ. ডিসটোর্সন বা বিশৃঙ্খলা : অভিধানে 'ডিসটোর্সন' শব্দের অর্থ হিসেবে 'বিকৃতি' উল্লেখিত হলেও এ কৌশলটি বুঝতে আমরা বরং 'বিশৃঙ্খলা' শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী (Zillur, 2002: 221)। ছোটগল্পের খণ্ড-ভগ্নাংশ ও বক্ররৈখিক সময় পরিক্রমা এবং আখ্যানের বিন্যাসরীতি-সম্পৃক্ত কৌশলাদি এ প্রক্রিয়ায় বিবৃত হয়। সময়ের ধারাবাহিক প্রবহমানতার পরিবর্তে কখনো আকস্মিক পশ্চাদ্ধাবন, সেখান থেকে উল্লম্ফনধর্মী রীতিতে ভবিষ্যৎকালের উপস্থাপন, কখনো বা বর্তমান থেকে অতীতে বা ভবিষ্যৎ থেকে বর্তমানে, কখনো কখনো একটি নির্দিষ্ট কালপরিসরেই ঘটনার আবর্তন বা চলমানতা, সর্বোপরি কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তের ব্যাপ্তিতে দীর্ঘ ঘটনাংশের রূপায়ণ — সবকিছুই এ রীতির অন্তর্গত। আবার কখনো কখনো ঘটনা সংঘটনের কাল বা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কোনোটিই স্পষ্ট হয়ে উঠতে নাও পারে। চরিত্রের স্মৃতিচারণা, কল্পনা, ফ্যান্টাসিতে সময়কাঠামো অস্পষ্টভাবে উপস্থাপনের সুযোগও এ রীতিতে যথেষ্ট থাকে। ঘটনার ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খলতার পরিবর্তে এলোমেলো উপস্থাপন, বৈপরীত্যমূলক ঘটনাদির পাশাপাশি সন্নিবেশ, এমনকি ঘটনার পরস্পরবিরোধী পরিণতির মাধ্যমে পাঠককে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না দেয়ার প্রচেষ্টা এ রীতির অনুসরণে রচনায় গৃহীত হয়। এ গল্পের আদ্যোপান্ত জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে স্থান ও সময়গত বিকৃতির দৃষ্টান্ত। এক্ষেত্রে গল্পের প্রথম দুই পৃষ্ঠার বিবরণ লক্ষ করা যেতে পারে। যেহেতু সমষ্টিমানুষেরা গল্পকথক হিসেবে এ গল্পে স্মৃতিচারণ করছে, তাই সেখানে ব্যক্তির নিজস্ব আবেগ, অনুভব, ভাবনা, সংবেদনারাশি আর ব্যক্তিক থাকেনি, একের সঙ্গে অন্যের ভাবনারাশি মিলেমিশে বিস্তৃত পরিসরে জট পাকিয়ে পুরো বর্ণনাকেই চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আড্ডার ভঙ্গিতে অবিরাম কথোপকথন। ফলে যে বিস্তীর্ণ ক্যানভাসের সম্প্রসারণ ঘটে, সেখানে স্থানিক পরিসর ও সময় বারবার বদলে যায়। কারণ যেসব ঘটনা অতীতে ঘটেছে, সেগুলো বর্তমানে স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে বলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পটভূমিতে সময়ের উল্লম্ফনধর্মিতা এসব ঘটনায় বারবার প্রভাব বিস্তার করে। গল্পটি শুরু হয়েছে দক্ষিণ মৈশুন্দি মহল্লার কুটির শিল্পসমূহের শিল্পায়নের বৃত্তান্ত স্মরণের প্রচেষ্টায়। অথচ গল্পকথকদের স্মৃতিচারণায় প্রতিষ্ঠিত কুটির শিল্পসমূহের প্রতিষ্ঠার বিবৃতির পরিবর্তে তরমুজের মতো একটি ফলের সূত্র ধরে মহল্লাবাসীর বিবিধ কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন উপস্থাপিত হয়। তরমুজওয়ালারা মহল্লার কোথায় বসে, তাদের দোকানের কারণে কীভাবে মহল্লায় জটলা সৃষ্টি হয়, সেই বিবরণের মধ্যে একপর্যায়ে অনুপ্রবেশ ঘটে বালকদলের। তারা কোন কোন খেলায় ব্যস্ত থাকে, সেই বৃত্তান্তে সংযুক্ত হয় লেদমেশিনের শব্দ, যা গল্পকথকদের পুনরায় মনে করিয়ে দেয় মহল্লার কুটির শিল্পায়নের ইতিবৃত্ত। এরপর তরমুজের প্রতি তাদের আগ্রহের স্বরূপ বিবৃত হলে এর সঙ্গে লজেন্স কারখানার মালিক হাজি আব্দুর রশিদের সম্পৃক্ততার কথা জানা যায়। এভাবে একটি বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়কে সংযুক্ত করে লেখক স্থানিক পরিসরকে গল্পকথকদের স্মৃতিচারণায় ক্রমশ বদলে ফেলেন। সময়ের উল্লম্ফনধর্মিতাও এ বিবরণে লক্ষণীয়। গল্পকথকরা কত বছর বয়সে এসে বা জীবনের কোন পর্যায়ে পৌঁছে স্মৃতিচারণা করছে, তা সমগ্র গল্পেই অনুল্লেখিত। ফলে 'মহল্লায় গরম পড়তে শুরু করলে' (শহীদুল, ২০০৭ : ১২৮) এভাবে সময়কে অস্পষ্ট রাখা হয়। কারণ এ তথ্যে কোনো বছরের উল্লেখ নেই, যার মাধ্যমে ঘটনাসমূহ সংঘটনের কাল জানা সম্ভব। বাবুল মিয়া ও তার সঙ্গীরা হট্টগোল করে একপর্যায়ে গ্রাজুয়েট স্কুলের দিকে চলে গেলে

> তখন মহল্লায় নীরবতা নামে ... তখন এই নীরবতার ভেতর আমরা মহল্লায় লেদ মেশিন চলার শব্দ শুনতে পাই; আমাদের তখন মহল্লার ইতিহাস মনে পড়ে। ... তখন মহল্লার বালকেরা ফিরে আসে, কারণ তাদের তখন ইচ্ছে করে মহল্লার রাস্তায় গোল্লাছুট খেলতে ... আমাদের সামনে তরমুজ নির্বাচনের এক সঙ্কট উপস্থিত হয়, যা আমাদের পিতাদের ছিল না, তরমুজ তখন, সে সময়, এক রকমের ছিল, ... গরম পড়তে শুরু করলে তরমুজওয়ালারা তরমুজ নিয়ে আসে, তখন মহল্লায় মাছি বেড়ে যায়, ... তখন হাজি আব্দুর রশিদ তার লেবেঞ্চুস কারখানার নির্মাণকাজের জন্য বালু এনে মন্দিরের সামনের রাস্তার ওপর ফেলে ... আমরা তখন চাকু অথবা বঁটি অথবা দা দিয়ে তরমুজ কেটে খাই, রাস্তার বালকেরা তখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে ... তখন মহল্লায় লেদ মেশিনের শব্দ থেমে যায়, ... আমাদের তখন মনে হয় যে, তরমুজের বিচির জন্য আমরা মহল্লায় হয়তো একটি গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ব;... আমাদের পিতারা তখন তরমুজ খায় ... এবং এভাবে আমরা তরমুজ খেয়ে যখন জিরাই তখন মহল্লায় নাট-বল্টু তৈরির ইতিহাস আমাদের মনে পড়ে ... এবং আমরা তখন মহল্লার একমাত্র কবি, একমাত্র প্রেমিক, একমাত্র ঘর-পলাতক নারী এবং একমাত্র আত্মহত্যার ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারি; (শহীদুল, ২০০৭ : ১২৮-১৩০)

উক্ত দীর্ঘ বাক্যাংশে উপর্যুপরি পনেরবার 'তখন' নিত্য সম্বন্ধবাচক অব্যয় প্রযুক্ত হয়েছে, যদিও পদটি এ গল্পে কোনোভাবেই সময়ের নির্দিষ্টতাকে মান্য করে না। কুশীলবদের দ্বারা সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ এর মাধ্যমে জানা গেলেও সময়ের বিস্তার বা আয়তন এক্ষেত্রে অনির্দেশ্যই থেকে যায়। কেননা এর সঙ্গে কোনো দিন, মাস, বছরের উল্লেখ নেই। অথচ আমরা বুঝতে পারি, প্রতিটি কাজ সংঘটনের সময় ভিন্ন এবং 'তখন' শব্দের অন্তরালে অনিবার্যভাবেই সময়ের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে, যদিও লেখক গল্পে এ ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত দেননি। সাধারণভাবে পাঠক ধারণা করতে পারে, এসব ঘটনা গল্পকথকদের অতীত জীবনের অংশ, অথচ একসময় সেই অতীতের ধারাবাহিকতায় বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পৃক্ত ছিল। মোটাদাগে বোঝা যায়, গল্পকথকদের পিতারাও মহল্লার তরমুজওয়ালাদের তরমুজের প্রতি আগ্রহী ছিল, তাদের সময় তরমুজের ভেদাভেদ ছিল না, এবং তাদের সন্তানদের সময়ে এ সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। বর্ণনাভঙ্গির জটিলতা, বিশেষত অতীত প্রক্ষেপণ ও ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ, সময়ের বঙ্কিম-ভঙ্গুর বিস্তার ও উল্লম্ফন, স্থানসমূহের অবিরাম অবস্থান পরিবর্তন, টুকরো টুকরো বর্ণনাসমূহকে পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করানোর সুযোগ হিসেবে লেখক সচেতনভাবেই গল্পকথকদের স্মৃতিচারণকে এক্ষেত্রে হাতিয়ার করেছেন। সমষ্টিমানুষের চেতনাপ্রবাহকে অনুসরণ করায় গল্পের বর্ণনাভঙ্গিতে এ ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হয়। লক্ষণীয়, এ গল্পের পুরোটাই স্মৃতিচারণ, কাজেই সে অর্থে ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ নেই। কিন্তু অতীতের কোনো ঘটনা যখন ধারাবাহিকতা মেনে পরবর্তীকালে সম্পন্ন হয় সেই বিবেচনায় একে ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ বলা যেতে পারে। যেমন, আব্দুল গফুরের তিন ছেলেমেয়ে সম্পর্কিত যেসব আখ্যান এ গল্পে উপস্থাপিত, এসবের সময়গত কোনো ক্রমোল্লেখ নেই। এমনকি তার আত্মহত্যার বৃত্তান্তও গল্পে শুধু একটি বাক্যাংশে বিবৃত, নিছক তথ্য হিসেবে। কিন্তু লেখক এ প্রসঙ্গে মহল্লাবাসীর মনোভঙ্গিকে যেভাবে বিবরণে ফুটিয়ে তোলেন, তাতে অনুমান করা যায়, জনৈক প্রেমিকের সঙ্গে শেফালি আখতারের পালিয়ে যাবার কারণে তার পিতা আব্দুল গফুর অপমানিত হয়ে আত্মহত্যা করে। পরবর্তীকালে ঝর্ণা বসাকের প্রতি প্রেমের উপলব্ধিতে একপর্যায়ে তার বড়

ছেলে আজিজুল হক উন্মাদ হয়ে গেলে মহল্লাবাসী তাকে পাগলাগারদে পাঠায়, এরপর তার ছোট ভাই আমিনুল হক সাপের কামড়ে মারা গেলে মহল্লাবাসী রহিমা বিবির বাড়িটি ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করে। এভাবে লেখক নিজে থেকে না বলে বিভিন্ন আখ্যানে বিবৃত টুকরো টুকরো ঘটনা, প্রসঙ্গ ও চরিত্রসমূহের আন্তঃসম্পর্ক গ্রন্থনায় পাঠককে উদ্বুদ্ধ করেন।

ঘ. মিনিমালিজম বা সংকোচনধর্মিতা : গতানুগতিক চরিত্র ও বিষয়কে পরিহার করে ভিন্নধর্মী চরিত্র এবং অভিনব বিষয়কে উপস্থাপনে এ রীতি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অহেতুক বিশেষণ, অব্যয় এবং অলংকারের ব্যবহার, দীর্ঘ ও অনুপুঙ্খ বর্ণনা, তথ্যাদির সমাহার পরিহার করে লেখক এমনভাবে রচনাকে গড়ে তোলেন, যেখানে পাঠক নিজের মত করে রচনাটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের সুযোগ পায়। এ গল্পে লেখক বিভিন্ন প্রসঙ্গ সচেতনভাবেই পরিহার করেছেন। আজিজুল হকের মানসিক ভারসাম্যহীনতা প্রসঙ্গে ঝর্ণা বসাকের ভূমিকা বা অভিব্যক্তি, অথবা তার পিতা ননী বসাকের অত্যাচারের স্বরূপ সম্পর্কে লেখক গল্পে সামান্য আভাসও দেন না। আবার শেফালি আখতার মহল্লার উঠতি তরুণদের পরিবর্তে কেন জনৈক প্রেমিকের সঙ্গে মহল্লা পরিত্যাগ করে, কীভাবে তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সে ব্যাপারেও তিনি নীরব থাকেন। তেমনিভাবে বাহুল্য বিবেচনায় গল্পকথকদের বা তাদের স্ত্রীদের নাম, তরমুজওয়ালাদের নাম, শেফালি আখতারের প্রেমিকের নাম জানা পাঠকের পক্ষে সম্ভব হয় না।

ঙ. ফ্র্যাগমেন্টেশন বা খণ্ডিতকরণ : উত্তরাধুনিক ছোটগল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান যেমন — আখ্যান, চরিত্র, ভাবনা, চিত্রকল্প এবং আনুষঙ্গিক তথ্যাদি সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপিত হয় না, বরং এলোমেলোভাবে বর্ণনার চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। এতে বিবৃত বিভিন্ন দৃশ্যের পারস্পরিকতা, চরিত্রের বিস্তার এবং ঘটনাসমূহের বিন্যাসকে উপরিতল থেকে আপাতদৃষ্টিতে পাঠকের নিকট আধুনিক মনে হতে পারে। খণ্ডিতকরণ সেই ধারণা বদলে দেয়। প্রমিত লেখ্যরীতি, লেখকের লেখনীর বিশিষ্ট ভঙ্গির সঙ্গে জনমানুষের প্রাত্যহিক জীবনের কথোপকথনের আদল, কবিতা ও গদ্যের যথেচ্ছ সন্নিবেশ, বিভিন্ন ভাষার শব্দসমাবেশ মিলেমিশে গল্পের প্রচলিত কাঠামোকে বদলে দেয়। ফলে গল্পে বিধৃত ঘটনার পারম্পর্য, চরিত্রের ক্রমবিস্তার, দৃশ্যসমূহের ধারাবাহিকতাকে বোধগম্য করতে পাঠককেই দায়িত্ব নিতে হয়। এ গল্পে আজিজুল হকের আখ্যান উপস্থাপনায় লেখক সচেতনভাবেই উত্তরাধুনিক কবিতাকে অবলম্বন করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এটিকে গতানুগতিক কবিতা বলে মনে হলেও এর বিশিষ্ট ভূমিকা গল্পে লক্ষণীয়। লেখক যেহেতু বিশেষ পরিকল্পনা করেই এ আখ্যানের অনেকটাই অস্পষ্ট এবং অকথিত অবস্থায় রেখেছেন,[১১] তাই এর বিকল্প বিবেচনায় কবিতাটি হয়ে উঠতে পারে পাঠকের এ আখ্যান সম্পর্কিত ধারণা অর্জনের হাতিয়ার। কবিতাটি লক্ষ করলে বোঝা যায়, এর অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যসমূহ আজিজুল হকের আখ্যানে প্রতিফলিত বৈশিষ্ট্যসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কবিতায় চরণের পর চরণ বিন্যাসের পরিবর্তে পাশাপাশি এদের প্রয়োগ তার মনোজাগতিক বিক্ষুব্ধতার ইঙ্গিত দেয়। সেকারণে চরণে চরণে নির্দিষ্ট দূরত্বগত শৃঙ্খলা অনুপস্থিত। তবে এ প্রবণতা তার তীব্র আবেগের বহিঃপ্রকাশও বটে। কবিতাটিতে ব্যবহৃত শব্দসমষ্টি তার অন্তর্লোকে সঞ্জাত ভাবরাশিকে সরাসরি প্রকাশের পরিবর্তে দুর্বোধ্যতা সৃষ্টির সহায়ক অনুষঙ্গ

হয়ে ওঠে। চরণগুলোর অসম আয়তন, অর্থ সম্প্রসারণের তাগিদে পদগুলোর সাপেক্ষ প্রয়োগ, কখনো বা নির্দিষ্ট কিছু শব্দের পরিকল্পিত স্থান পরিবর্তন, সর্বোপরি বাচ্যার্থের আড়ালে ব্যঞ্জনার্থ প্রকাশের সম্ভাবনা কবিতাটির আবেদনকে বাড়িয়ে দেয়। আজিজুল হকের অন্তর্লোকের সংবেদনারাশির বহিঃপ্রকাশে 'বিন্দু', 'রেখা', 'বাক্য', 'অর্থ', 'জীবন', 'মাটি', 'পানি', 'আকাশ', 'স্বপ্ন' 'নিদ্রা', 'ভালবাসার অঙ্কুর', 'জাগরণ', 'পীড়ন', 'অর্থ ছিল না' (অর্থহীনতা অর্থে), 'তোমার কথা', 'অন্য কথা' প্রভৃতি শব্দপুঞ্জের ধারাবাহিকতা লক্ষ করলে তার ব্যর্থ প্রেমাখ্যানের সঙ্গে এর সম্পৃক্ততা বোঝা সম্ভব। পৃথক কবিতা ও আখ্যান হিসেবে এদের খণ্ডিত আবেদন পরস্পরের যোগসাজশে গল্পের ধারাবাহিক পরিণতি নির্দেশে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

চ. ম্যাজিক রিয়েলিজম বা জাদুবাস্তবতা : জাদুবাস্তবতা উত্তরাধুনিক সাহিত্যভাবনায় অর্জন করে গুরুত্বপূর্ণ অভিনিবেশ। বাস্তব-কাল্পনিক-উদ্ভট ভাবনারাশির মিশ্রণ, পরিকল্পিতভাবে কালিক বিন্যাসের পরিবর্তন, জটপাকানো এবং গোলকধাঁধাপূর্ণ আখ্যান, ফ্যান্টাসি ও স্বপ্নের বিবিধ ব্যবহার, পুরাণ এবং রূপকথা, অভিব্যক্তিবাদী এবং পরাবাস্তববাদী বর্ণনা, রহস্যময় বা গোপনীয় বিদ্যা, ভয়ঙ্কর এবং অব্যাখ্যেয় উপস্থাপনা (রাশিদ, ২০০৩ : ১৫৫) প্রভৃতির সম্মিলনে জাদুবাস্তবতার[১২] সামগ্রিক অবয়ব নির্মিত হয়। এ গল্পে হাজি আবদুর রশিদের তরমুজের কারখানা বা 'হাজি ফুড প্রডাক্ট কোম্পানি' স্থাপনের ইতিবৃত্ত জাদুবাস্তবতাশ্রিত। সমগ্র গল্পে এ আখ্যানের বিস্তার গল্পকথকদের স্মৃতিচারণায় টুকরো টুকরো বিবরণে ভাষ্যরূপ পেয়েছে। লক্ষণীয়, এর ফলে পাঠককে কিছু জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, সমগ্র গল্পে লেখক তাকে যেহেতু সরাসরি উপস্থাপন করেন না, বরং গল্পকথকদের বয়ানই হয়ে ওঠে তার অবয়ব নির্মাণের অবলম্বন, তাই ব্যক্তি হিসেবে তার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, মানসিকতা জানা-বোঝার সুযোগ পাঠকের থাকে না। এর ফলে গল্পকথকদের আবেগ, অনুভূতি, প্রত্যাশা, স্বপ্ন তার বলে বিবেচনার ঝুঁকি পাঠকের থাকে। লেখক এখানেই বিশেষ কৌশল অবলম্বন করেন। লক্ষণীয়, হাজি আব্দুর রশিদের লেবেঞ্চুসের কারখানা রয়েছে। তরমুজের প্রতি তার আসক্তি যে মিথ্যা নয়, তা গল্পে বিবৃত বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়। কিন্তু সে যে রাতের বেলা ঘুমিয়ে তরমুজ কৌটায় বাজারজাতকরণের কারখানা স্থাপন-সংক্রান্ত স্বপ্ন দেখে, অথবা অন্তর্লোকে যে অনুরূপ অভিলাষই পোষণ করে, এ ব্যাপারে পাঠকের নিশ্চিত হবার কোনো সুযোগ নেই। পুরো ব্যাপারটিই যে গল্পকথকদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ, এমন সম্ভাবনা যথেষ্ট। গল্পকথকদের ভাষ্য থেকে জানা যায়, তরমুজ খেয়ে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং বিছানায় শুয়ে আম বা অন্য ফল নয়, বরং তরমুজ সম্পর্কেই বারবার ভাবে। এমনকি এক পর্যায়ে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিঃসঙ্গ বিধবা বৃদ্ধা প্রতিবেশী রহিমা বিবির দেড়কাঠার বাড়িটি দখলের চক্রান্ত করে। ইতঃপূর্বে আমরা গল্পের বিবরণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি, এ ঘটনাটি ছিল নিছকই গুজব। এমনকি তার এ উদ্যোগ ব্যর্থ হলেও স্বপ্নের ভেতর মহল্লা ও দেশের ভবিষ্যৎ ভেসে ওঠায় সে যে 'মহল্লায় লেদ মেশিন বসানোর পরিকল্পনা ত্যাগ করে নাই' (শহীদুল : ২০০৭, ১৩২) এটি গল্পকথকদের নিজস্ব কল্পনা। কারণ তারা জানে, তাদের 'জীবনের অবসরের সঙ্গে এই ফলটির সম্পর্ক কত নিবিড়' (শহীদুল, ২০০৭ :

১৩২)। সেকারণেই হাজি আব্দুর রশিদের মাধ্যমে তারা বরং নিজেদের অভিলাষ পূর্ণ করার কাল্পনিক বয়ানেই সমগ্র গল্পে ব্যতিব্যস্ত থাকে। যেহেতু মহল্লার বাসিন্দারা তরমুজের প্রতি আসক্ত এবং 'তরমুজের গুণের কোনো শেষ নাই' (শহীদুল, ২০০৭ : ১৪১), তাই এর মূল্য বৃদ্ধি পেলে তাদেরকেই সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়। আর্থিক সংকটের কারণে আস্ত তরমুজের পরিবর্তে ফালি করা তরমুজের একটি টুকরো নিয়ে গল্পকথকরা যখন বাসায় ফেরে, তখন তাদের উপলব্ধি 'আমাদের দুর্ভিক্ষের কথা মনে হয়, আমাদের জীবন ম্রিয়মাণ হয়ে আসে' (শহীদুল, ২০০৭ : ১৪০)। তরমুজ সারা বছর ফ্রিজে সংরক্ষণ করা যায় না বলে গল্পকথকদের সংকট যখন চরমে ওঠে, তখন নাটকীয়ভাবে হাজি আব্দুর রশিদের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান হয়। মৃত্যুর আগে পাঁচবার তরমুজ খেতে চেয়েও সেই সাধ না মেটায় সে তার বড় ছেলেকে তরমুজ কৌটায় বাজারজাতকরণের কারখানা স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে মহল্লাবাসীর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়। অর্থাৎ 'হাজি ফুড প্রোডাক্টস কোম্পানি' প্রতিষ্ঠার অন্তরালে হাজি আব্দুর রশিদের বিচক্ষণতা থাকলেও গল্পে এ প্রসঙ্গে বিবৃত তার আকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্নের অনেকটাই গল্পকথকদের নিজস্ব ভাবনাপ্রকল্প। এভাবেই গল্পকথকদের প্রত্যাশা-অভিলাষের সঙ্গে হাজি আব্দুর রশিদের দূরদর্শী উদ্যোগ মিলেমিশে দক্ষিণ মৈশুন্দির কুটিরশিল্পের ভাণ্ডারকে আরো সম্প্রসারিত করে।

১.৩ চরিত্রায়ণ

এ গল্পে গল্পকথকদের রয়েছে দ্বৈত ভূমিকা। একদিকে তারা গল্পের বিবৃতিদাতা, অন্যদিকে সমষ্টিমানুষ বা মহল্লাবাসীর অন্তর্গত। যেহেতু নিজেদের সম্পর্কে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, পাশাপাশি মূল্যায়নের ভূমিকাও নিজেরাই নেয়, তাই তাদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সর্বদা যুক্তিনিষ্ঠ হয় না। এছাড়াও জনসমাজে প্রচলিত রটনা, গুজব, জনশ্রুতি, লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার তাদের সিদ্ধান্তকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। হাজি আবদুর রশিদের তরমুজ ফ্যাক্টরি স্থাপন প্রকল্প সম্পর্কে তাদের মনোভঙ্গিকে ইতোমধ্যেই আমরা উল্লেখ করেছি। যেহেতু দক্ষিণ মৈশুন্দি মহল্লাতেই তারা বেড়ে উঠেছে, তাদের বাল্য-কৈশোর-যৌবনকাল এখানেই অতিক্রান্ত, তাই এর খুঁটিনাটি সম্পর্কে গল্পকথকদের রয়েছে সম্যক অবহিতি। অতি তুচ্ছ বিষয় বা ঘটনাও তাদের বয়ানের মাধ্যমে পাঠকের গোচরীভূত হয়। নিম্ন-মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের সন্তান হিসেবে মলিন খাতা এবং পাতাছেঁড়া বই নিয়ে তাদের বিদ্যাচর্চার ব্যাপ্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের শিশুতোষ ছড়া মুখস্থ করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। কাজ চালিয়ে নেয়ার মতো পড়ালেখা শেখার পর বিদ্যালয়ের গণ্ডি ছেড়ে অর্থোপার্জনের প্রয়োজনে বিভিন্ন কুটির শিল্পের শ্রমিক বা ইলেক্ট্রনিকসের দোকানের কর্মচারী হিসেবে তারা দায়িত্ব পালন করে। মহল্লার সমবয়সী খেলার বন্ধু বা আড্ডার সঙ্গীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ যে স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখা, প্রেম-নারী-যৌনতা সম্পর্কিত দুর্বার কৌতূহল পরস্পরের কাছে অবলীলায় জানানো, মহল্লার স্কুলের সামনে ঘোরাফেরা এবং বালিকা বা কিশোরীদের সঙ্গে প্রেমের প্রচেষ্টায় আলাপ, গলির ভেতর তরমুজ বিক্রিস্থলে আড্ডা দেয়া ও তরমুজের স্বাদ, গন্ধ, রং ও ওজন পরীক্ষায় তাদের অসীম আগ্রহ, তরমুজওয়ালার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয় ভাষায় প্রয়োজনে-

অপ্রয়োজনেও আলাপচারিতা, পাড়া-প্রতিবেশীর ব্যাপারে খবরাখবর আদানপ্রদান সবকিছুই তাদের জীবনচর্যার অংশ। ব্যক্তি হিসেবে তাদেরকে পৃথকভাবে চেনার কোনো সুযোগ লেখক পাঠককে দেন না। কেননা তারা নামহীন। তাদের পারস্পরিক আচার-আচরণ, চলন, বলন, আলাপ এমনকি চিন্তার ধরন এতটাই সাদৃশ্যপূর্ণ যে ব্যক্তিক পরিচয়টি তাদের ক্ষেত্রে গৌণ হয়ে যায়। যদিও বিষয়টি বাস্তবসম্মত নয়, কেননা, প্রতিটি মানুষের ভেতরই নিজস্ব কিছু প্রবণতা, বা দোষ-গুণ থাকে, যার ভিত্তিতে অন্যদের চেয়ে তার স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবু লেখক পুরাতন ঢাকার জনজীবনে যূথবদ্ধতার স্বরূপ উপস্থাপনে গল্পকথকদের সমন্বিত অবয়র নির্মাণে আগ্রহী, ব্যক্তিমানুষ যেখানে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন। আধুনিক ঢাকার নগরজীবনে ব্যতিব্যস্ত ব্যক্তিমানুষের নৈঃসঙ্গ্যের বিপরীতে দক্ষিণ মৈশুন্দির মহল্লাবাসীর প্রাত্যহিক জীবনের কলরোল তাদের বিশিষ্ট জীবনযাত্রার সূচক। লেখক তাদের ব্যক্তিসত্তার গড়নকে পাঠকের নিকট স্পষ্ট করেননি। রেখাচিত্রধর্মী ভঙ্গিতে তাদের স্বভাব, অভ্যাস, প্রবণতা ও ভাবনার গড়ন সম্পর্কে গল্পে বিভিন্ন উল্লেখ থাকলেও রক্তমাংসের মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তারা পাঠকের কাছে ধরা দেয় না। কিছুটা স্পষ্ট, কিছুটা অস্পষ্টভাবে তাদের আবছায়া সত্তাকে লেখক মূর্ত করে তোলেন। আজিজুল হকের কবিতার মর্মার্থ অনুধাবন দূরের কথা, কবিতা লেখার সামর্থ্য বা আগ্রহ কোনোটিই তাদের নেই। বিশেষ কোনো আকাঙ্ক্ষাও তাদের স্বভাবে পরিলক্ষিত হয় না। বিবাহিত জীবনে সুখী মানুষগুলো কোনোমতে খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকতে পারলেই সন্তুষ্ট। সবার সঙ্গে মিলেমিশে অতি সাধারণ দিনযাপনের মধ্যেও যে জীবনকে উপভোগ করা যায়, সেটিই এ চরিত্রগুলোর আবেদনকে বিশিষ্ট মাত্রায় পাঠকের কাছে উন্নীত করে। অন্যদিকে, এ গল্পের অন্যান্য চরিত্রগুলোর বিবিধ কর্মকাণ্ড ও মনোভাবনা গল্পকথকদের বিবরণে প্রকাশিত হয় বলে তারাও অনেকটাই অস্পষ্ট থেকে যায়। এ গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে প্রচলিত ধরনের কোনো একক চরিত্র নেই। ব্যক্তিমানুষের কর্তৃত্বসর্বস্ব ভূমিকা পালন বা তার মহত্ত্ব, বীরত্বের পরিচয়দানও এ গল্পে লেখকের অভীষ্ট নয়।[১৩] কাল্পনিক আদর্শের জয়জয়কারের পরিবর্তে তিনি পুরাতন ঢাকার মানুষদের যেভাবে দেখেছেন, তারই রূপায়ণ ঘটিয়েছেন গল্পে। মধ্যবর্তী ও পার্শ্ব চরিত্রগুলোর ভূমিকা গল্পের ঘটনা ও দৃশ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী উপস্থাপিত। তবে তারা যেহেতু গল্পকথকের বিবরণের মাধ্যমে উপস্থিত থাকে, সেকারণে তাদের আচার-আচরণ, বিশ্বাস, ভাবনা ও মনোভঙ্গির অনুপুঙ্খ রূপায়ণ সম্ভব নয়। সেকারণেই রহিমা বিবির সম্পর্কে প্রায় কোনো তথ্যই পাঠক জানতে পারে না, যদিও হাজি আব্দুর রশিদের অপতৎপরতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে এ প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তেমনিভাবে আব্দুল গফুরের 'সর্বশেষ পতনে'র বৃত্তান্ত গল্পকথকের বিবরণে প্রকাশিত না হওয়ায় গল্পের ঘটনাস্রোতের প্রবাহ অনুধাবনে পাঠকের অনুমান ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না।

১.৪ দৃষ্টিকোণ

সমগ্র গল্পটি একাধিক ব্যক্তির সমষ্টিচেতনামূলক স্মৃতিচারণে বর্ণিত বলে উত্তম পুরুষ হিসেবে গল্পকথকদের সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটির ঘটনাপ্রবাহ, আখ্যানভাগ ও কুশীলবদের ভূমিকা নির্দেশিত। তবে এর ভেতরে কখনো কখনো অন্য চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দুর অনুপ্রবেশ ঘটে।

> ঘোড়ার ডিমের কথায় আমরা বুঝতে পারি যে, আমিনুল হক কোনো একদিন বাঁশি বাজানো থামিয়ে যখন তাদের বাড়ির প্রাচীরের ওপর দিকে তাকায় তখন সে সেই প্রাচীরের ওপর ডিমের মতো একটি মুখ দেখতে পায়, ... পুতুলের মুখটির দিকে তাকিয়ে আমিনুল হক ক্রমাগতভাবে দেয়ালের কাছে সরে আসে এবং একদিন ওপর দিয়ে তাকায়, তখন সেদিন, সে এই খণ্ডিত নারীকে আবিষ্কার করে, কিন্তু তখন তার আর ফিরে যাওয়ার পথ থাকে না, (শহীদুল, ২০০৭ : ১৩৯)

এ উদ্ধৃতিতে গল্পকথকদের উত্তম পুরুষের সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর আকস্মিকভাবে গল্পের পার্শ্বচরিত্র আমিনুল হকের প্রেক্ষণবিন্দুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সে প্রথমবার পুতুলকে কোন পরিস্থিতিতে, কীভাবে দেখেছে, এ অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশের পরবর্তী পর্যায়ে তার জীবনের পরিণতিনির্দেশক শেষ বাক্যাংশটি পুনরায় বিবৃত হয়েছে গল্পকথকদের সমন্বিত দৃষ্টিকোণে। কখনো কখনো তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ হিসেবে বিবেচনার সুযোগ থাকে। কেননা একাধিক ব্যক্তির প্রেক্ষণবিন্দু সংযুক্ত হওয়ায় পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশের বর্ণনা দৃশ্যগুলোতে শব্দ, বর্ণ, গন্ধ সহযোগে অনুপুঙ্খভাবে ফুটে ওঠে —

> তখন মহল্লার বাতাস সুগন্ধে ভরে যায়, স্কুল থেকে বাসায় ফিরে আমরা বই রেখে কফিলুদ্দিন ব্যাপারির নূতন বিস্কুটের কারখানার দিকে দৌড় দিই, আমরা গিয়ে দেখি কারিগরেরা লম্বা লম্বা উঁচু টেবিলের ওপর ময়দা ছেনে টিনের ট্রে-র ওপর বিস্কুট বানিয়ে রাখে এবং নিচে মেঝেতে পাতা চাদরের ওপর মহল্লার লোকেরা বসে অপেক্ষা করে, তারপর মৌলবি আসেন এবং আমরা 'ইয়ানবি সালামালাইকা' বলে মিলাদ পড়ি, মিলাদ পড়া শেষ হলে কুঁড়েঘরের মতো চুল্লির চারকোণা দরজা খুলে ফেলা হয় এবং নৌকার বৈঠার মতো লম্বা কাঠের হাতা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে কারিগরেরা এই কারখানার প্রথম তৈরি বিস্কুটের ট্রে বের করে আনে এবং কফিলুদ্দিন ও তার ছেলেরা ছোট ছোট ঠোঙ্গায় এই বিস্কুট ভরে আমাদের হাতে ধরিয়ে দেয়; এভাবে মিলাদ পড়ানোর পর হাজি আব্দুর রশিদের লজেন্স কারখানায় উৎপাদিত প্রথম লজেন্সের ভাগ আমরা পাই, কিন্তু লেদ মেশিন বসানোর পর ৪৪০ ভোল্টের ১/২ ঘোড়া শক্তির মটর বসানো হয় এবং আমরা ভিড় করে আব্দুল জলিলের কারখানা দেখতে যাই, পুনরায় মিলাদ পড়ার পর আমরা জিলাপি খাই এবং মহল্লায় শব্দ ও মিষ্টির গন্ধের ভেতর আমাদের ল্যাংড়া পুতুলের কথা মনে পড়ে, (শহীদুল, ২০০৭ : ১৩৭)

১.৫ উন্মুক্ত প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তি

উত্তরাধুনিক ছোটগল্পে বদ্ধতার (closure) (রণবীর, ২০১১ : ১০৮-১০৯) ধারণাকে সচেতনভাবে পরিহার করা হয় গল্পের ছকবাঁধা প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তির গণ্ডি অতিক্রমের তাগিদে। এ ধারণা রূপকথা থেকে শুরু করে ভিক্টোরীয় যুগের উপন্যাস — সর্বত্রই লক্ষণীয়, যা নির্দেশ করে কোনো আখ্যানের অন্তর্গত ঘটনাপ্রবাহের জটিলতাবিষয়ক চূড়ান্ত সমাধান ও পরিসমাপ্তি। উত্তরাধুনিক সাহিত্যে বদ্ধতার বিরোধিতা (anti-closure) বরাবর গুরুত্ব পায়। উত্তরাধুনিক সাহিত্যিকরা এ ধারণাকে সচেতনভাবেই পরিহার করতে চান। কারণ এর মাধ্যমে শাসকবর্গের আরোপিত মূল্যবোধ ও চিন্তাভাবনা আখ্যানে অনুপ্রবেশ করে। ফলে পাঠকের চেতনালোকে তা অনিবার্যভাবেই প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্য রাখে। প্রচলিত ধরনের প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তির পরিবর্তে অনির্দিষ্টভাবে কোনো রচনার সূত্রপাত, এর

পরিসমাপ্তিকে শেষে না রেখে আখ্যানভাগের মধ্যবর্তী অংশে বা অন্যত্র রাখার প্রচেষ্টা উত্তরাধুনিক ছোটগল্পে প্রাধান্য পায়। সেখানে যেহেতু পাঠকের অবাধ স্বাধীনতা থাকে ঘটনাপ্রবাহের গতি নিজের মত করে সাজিয়ে নেয়ার, তাই এর পরিসমাপ্তি বুঝতে তাকেই দায়িত্ব পালন করতে হয়। উত্তরাধুনিক রচনায় নিশ্চিতভাবে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সুযোগ প্রতিরোধের জন্যই লেখকরা বিকল্প বা সম্ভাব্য পরিস্থিতি নির্মাণের উপায় রাখেন। লক্ষণীয়, এ গল্পের প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তি উন্মুক্ত। ফলে এর আগে-পরে অন্য দৃশ্য স্থাপনের উপযুক্ত পরিস্থিতি রয়েছে। এ গল্পের সূচনায় গল্পকথকদের স্মৃতিচারণার বিস্তার ঘটেছে গরমকালে তরমুজওয়ালাদের গলির ভেতর তরমুজ বিক্রির আয়োজনে মহল্লায় জ্যাম সৃষ্টি হওয়ার দৃশ্যবিন্যাসের মাধ্যমে। এরপর তাদের স্মৃতিচারণায় অনুপ্রবেশ ঘটে বালকদলের, যারা হৈ-হুল্লোড় চালিয়ে ফুটবল নিয়ে খেলতে যায় গ্রাজুয়েট স্কুলের দিকে। পরবর্তী পর্যায়ে মহল্লায় নীরবতা নামলে লেদ মেশিনের শব্দে গল্পকথকদের চেতনালোকে জাগ্রত হতে থাকে মহল্লায় বিভিন্ন কুটির শিল্পের শিল্পায়নের বৃত্তান্ত। যদি এসব ঘটনা ও দৃশ্যসমূহ পরিহার করে হাজি আবদুর রশিদের অসুস্থাবস্থায় তরমুজ খাওয়ার সাধ জানানো এবং তা খেতে না পেরে তার ছেলেদের 'হাজি ফুড প্রোডাক্ট কোম্পানি' প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দানের মাধ্যমে গল্পটির শুরু হত, তাতেও পাঠকের পক্ষে গল্পের প্রতিপাদ্য অনুধাবনের অবাধ স্বাধীনতা থাকত। অথবা গল্পকথকদের বাল্যকালের স্মৃতিচারণায় পিতাদের অনুসরণে তরমুজের প্রতি তাদের দুর্বার আসক্তি গড়ে ওঠার দৃশ্যগুলো বিন্যাসের মাধ্যমেও গল্পটি শুরু হতে পারত। অর্থাৎ, আখ্যানভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঘটনাসমূহ ইচ্ছেমত সাজিয়ে নেয়ার উপযুক্ত স্থানপরিসর উত্তরাধুনিক গল্পের বিশেষ প্রবণতা, যেখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনা, কাহিনি ও চরিত্রের ধারাবাহিক অগ্রগতির বাধ্যবাধকতা প্রত্যাখ্যাত। সবগুলো দৃশ্যই মুক্ত, স্বাধীন বলে যেকোনোটি দিয়েই গল্পের প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তি ঘটার সুযোগ এতে থাকে। এ গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে হাজি আব্দুর রশিদের বড় ছেলে হাজি রইসুদ্দিনের পিতার নির্দেশ মেনে তরমুজ কৌটায় বাজারজাতকরণের কারখানা স্থাপন সম্পর্কিত পরিকল্পনা গল্পকথকদের অবহিত করার ঘটনায়, এবং শেফালি আখতারের প্রতি গল্পকথকদের অব্যক্ত প্রেমবোধের তীব্র হাহাকারে। তবে এ গল্পের পরিসমাপ্তি শেফালিকে হারিয়ে তার পিতার অপরাধবোধে ভুগে অবশেষে 'বাড়িতে এক নিঃসঙ্গ বায়ুচড়া দুপুরে কড়িবর্গার সঙ্গে ঝুলে থাকা'র (শহীদুল, ২০০৭ : ১৩৩) দৃশ্য অথবা আমিনুল হককে হারিয়ে পুতুল বেগমের শোকাচ্ছন্নতার দৃশ্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়েও ঘটতে পারার অনুকূল প্রতিবেশ ছিল। লক্ষণীয়, এ গল্পের পরিসমাপ্তি অংশে লেখক সচেতনভাবেই পূর্ণচ্ছেদ বা দাড়ি (।) পরিহার করেছেন, ব্যবহার করেছেন কমা (,)। অর্থাৎ এর খোলা পরিসমাপ্তি তিনি নির্দেশ করছেন, যেখানে এরপরও অন্য কোনো দৃশ্য সংযোজনের উন্মুক্ত সুযোগ থেকে যায়।[১৪]

১.৬ ভাষারীতি ও সংলাপ

এ গল্পে পুরাতন ঢাকার জনজীবনের নিজস্ব ভাবাবহ লক্ষণীয়, যেখানে ব্যক্তিমানুষের উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে সমষ্টিমানুষ বা মহল্লাবাসীর আড্ডা, গল্প-গুজব, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, পরিহাসকে নিত্যদিনের আচরণ ও অভ্যাস, অঙ্গভঙ্গিযোগে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

তরমুজের মতো ফলকে ঘিরে তাদের স্বভাবে সন্নিহিত এসব প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায় কখনো তরমুজওয়ালার কাছে গিয়ে ছেলেমানুষী ভঙ্গিতে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করায়, তার জবাবে সন্তুষ্ট হবার পর এর অন্তর্নিহিত কৌশল অনুধাবনপূর্বক ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে গালিগালাজ ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করায়। আঞ্চলিকতার প্রভাব এবং অশ্লীল শব্দের হরদম উপস্থিতি পুরাতন ঢাকার ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন—

> আমরা আবার তরমুজওয়ালার কাছে যাই, গিয়ে বলি, গ্রামের মানুষ এমন খবিশ ক্যালা, হালারা হোগা বাইর কইরা রাখে; (শহীদুল, ২০০৭ : ১৩৮)

মেয়েলি ভঙ্গিতে বাক্যগঠনের উদাহরণ রয়েছে গল্পকথকদের মাদের সংলাপে—

> হায় আল্লা অখনতরি ইস্কুলে যাসনিকা, (শহীদুল, ২০০৭ : ১৩১)

তাছাড়া পুরুষদের সম্মানার্থে 'মিয়া' এবং পরিচিত-অপরিচিতদের গালিগালাজের জন্য 'হালা', 'পাগলের গুষ্টি' প্রভৃতি সম্বোধন সর্বত্র প্রচলিত শব্দসমূহের বিকৃত উচ্চারণেরই বহুল ব্যবহার এতদঞ্চলের ভাষায় লক্ষণীয়। ভদ্রসমাজের ব্যবহৃত মানভাষার একক আধিপত্য এতদঞ্চলের জনমানুষের নিকট গুরুত্বহীন। সেকারণেই শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে যে কোনো বয়সের মহল্লাবাসীই এ ভাষার বহুল ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এভাবেই স্থানীয়, প্রচলিত ভাষাভঙ্গি ও বাগবিধি, যা উত্তরাধুনিক সাহিত্যে বরাবর গুরুত্ব পায়, তা এ গল্পেও লক্ষণীয়। লিওতার উত্তরাধুনিক সাহিত্যে স্থানিক ও ক্ষুদ্রাবয়ব আখ্যানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত স্থানিক ভাষা ও বাচনভঙ্গির বৈচিত্র্য মহাআখ্যানে আরোপিত ভাষিক কাঠামো ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সমর্থ। স্থানীয় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে প্রচলিত ভাষায় রয়ে যায় সেসব উপাদান, যেগুলো তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। তাদের পারস্পরিক আলাপচারিতা, বাকবিনিময় ও সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব সর্বাধিক। জনসমাজ, সরকার, রাষ্ট্র ও প্রশাসন, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রভৃতির ত্রুটি, বিচ্যুতি ও অসঙ্গতিকে তুলে ধরতে উত্তরাধুনিক সাহিত্যিকগণ কৌতুক, লঘুরস, পরিহাস, শ্লেষ ও বক্রোক্তির অস্ত্রকে অবলম্বন করেন হাসির ছদ্মবেশে। বাখতিন জানিয়েছেন, হাসি নিছক ব্যক্তির অন্তর্লোকের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ নয়, বরং বদ্ধ সমাজকাঠামোর অচলায়তনে অন্তর্ঘাতের সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র। (তপোধীর, ২০০৯ : ৮৫) তাঁর কার্নিভাল তত্ত্ব নিঃসন্দেহে উত্তরাধুনিক সাহিত্যিকদের জন্য বিরাট অনুপ্রেরণা। বাখতিনের কার্নিভাল তত্ত্বে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে দ্বিবাচনিকতা ও বহুস্বরিকতার ধারণা।[১৫] দস্তয়েভস্কির উপন্যাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাখতিন এসব ধারণা গড়ে তোলেন। তাঁর মতে, দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে লেখক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র অথবা উত্তম পুরুষের বিবরণ, কোথাও কোনো কেন্দ্রীয় স্বর নেই। 'দস্তয়েভস্কির কথনবিশ্বে নিরন্তর দ্বিরালাপ (Dialogue) চলতে থাকে। এই দ্বিরালাপে কোনো স্বরই প্রধান হয়ে ওঠে না। তাই দস্তয়েভস্কির উপন্যাস দ্বিবাচনিক (Dialogic)। ... চরিত্রগুলি নিজেদের সঙ্গে, নিজেদের আদর্শের সঙ্গে ও অন্য চরিত্রের সঙ্গে নিরন্তর আলাপে মগ্ন থাকে। এইভাবে চরিত্রগুলি অপরের সাপেক্ষে অস্তিত্ববান হয়ে

ওঠে। অপরের সাপেক্ষে সত্তার এই দ্বান্দ্বিক বিন্যাসকে বলা হয়েছে দ্বিবাচনিকতা।' (সম্রাট, ২০১০ : ২৪) এ গল্পের গল্পকথকেরাও স্মৃতিচারণের সূত্রে অবিরাম কথা বলে চলে। কখনো বা তা অন্যদের সঙ্গে, কখনো বা নিজেদের সঙ্গে। আলাপের এ ভঙ্গি সরাসরি বিবৃত না হলেও তাদের চিন্তার ধরনে এর উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। আবার এর সঙ্গে পরিস্থিতি সাপেক্ষে, দৃশ্যের পরিবর্তনসূত্রে আবির্ভূত হয় অন্য কোনো চরিত্র। তখন তাদের সংলাপ বিনিময়ের সুযোগ শুধু সৃষ্টিই হয় না, বরং সংলাপের মাধ্যমে ভাবের আদানপ্রদানগত পরিসরেরও সম্প্রসারণ ঘটে।

> ক. হাজি আব্দুর রশিদের পেটে মোচড় দিলে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়েন এবং ভাবেন, আম কত রকমের হয় কিন্তু তরমুজ কেবল এক রকমের কেন হয়, সেই সময় অন্ধকার ঘরের ভেতর শুয়ে তিনি বুঝতে পারেন যে, তার ছেলে আব্দুল জলিলের জন্য একটি লেদ মেশিন বসানো দরকার;এবং এভাবে আমরা তরমুজ খেয়ে যখন জিরাই তখন মহল্লায় নাট-বল্টু তৈরির ইতিহাস আমাদের মনে পড়ে (শহীদুল, ২০০৭ : ১২৯)
>
> খ. আমরা মহল্লায় দিনে দেড় মণ নাট-বল্টু, দশ মণ পাউরুটি/বিস্কুট/লেবেঞ্চুস, সাত গ্রোস কাচের গ্লাস বানানোর পর বিকেলে অথবা সন্ধ্যায় জানতে পারি যে, তরমুজের ভেজাল হতে পারে, সাদা তরমুজের ভেতর লাল রং এবং চিনির পানি ইঞ্জেকশন করে ঢোকানো হয়, ফলে তরমুজ হয় লাল এবং মিষ্টি, এই কথা শুনে আমরা বিস্মিত এবং একই সঙ্গে ক্ষুব্ধ হই, আমাদের মনে হয় যে, মানুষের জীবনে কি কোনো মূল্যবোধই অবশিষ্ট থাকবে না! (শহীদুল, ২০০৭ : ১৩৪)

ক-সংখ্যক উদ্ধৃতির স্বগতোক্তি গল্পকথকদের। তাদের সমন্বিত চেতনাপ্রবাহে উঠে আসে হাজি আব্দুর রশিদের অসুস্থাবস্থার প্রসঙ্গ, এমনকি তিনি কী চিন্তা করছেন, সেই ভাবনারাশিও। বাস্তবে এমনটি অসম্ভব হলেও গল্পের ঘটনাপ্রবাহের প্রয়োজনে লেখক এ কৌশল অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ গল্পকথকেরা নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে আলাপের পরিস্থিতি সৃষ্টির পাশাপাশি আলাপেও অবিরাম লিপ্ত হয়ে চলে। উদ্ধৃতির শেষ বাক্যাংশে তাদের সচেতন ভঙ্গিতে স্মৃতিচারণার সূত্রে বোঝা যায়, পূর্বোক্ত অংশটুকু মূলত তাদের অবচেতনলোকে পুঞ্জীভূত ভাবনারাশির অবাধ উন্মোচনের বহিঃপ্রকাশ। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে গল্পকথকেরা অন্য কারো কাছ থেকে তরমুজের রঙ সম্পর্কিত যে আলাপ শোনে, তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে বাদানুবাদের ভঙ্গিতে। উদ্ধৃতাংশের প্রথম বাক্যটি তথ্যমূলক, যা নির্দেশ করে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের কর্মপরিসরকে। এ অংশটুকু তাদের নিজস্ব স্মৃতিচারণ। এরপর বাসায় ফিরে তারা যখন অন্য কারো সঙ্গে আলাপ করে, তখন তরমুজের ভেজাল রঙের বৃত্তান্ত সম্পর্কে জানতে পারে। শুধু তাই নয়, তরমুজওয়ালাদের জোচ্চুরি সম্পর্কে তাদের ক্ষোভ ও ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এ স্বগত সংলাপে। লক্ষণীয়, গল্পকথকদের স্বগত সংলাপে শুধু তারাই নয়, নেপথ্যে উপস্থিত রয়েছে তাদের পরিবারের সদস্যরা অথবা মহল্লার প্রতিবেশী বা আড্ডার সঙ্গীরা, এমনকি হীন চক্রান্তে জড়িত তরমুজওয়ালারাও। এভাবে আলাপের পরিসর কখনো বা তৈরি হয়, কখনো বা তারা নিজেরাই আলাপের ক্ষেত্রটি তৈরি করে এর সঙ্গে পাঠককে একাত্ম হবার সুযোগ করে দেয়।

বহুস্বরিকতা প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, বাখতিন স্বর বলতে কোনো চরিত্রের কণ্ঠস্বরকে বোঝাননি। তাঁর ধারণায়, ব্যক্তিক স্বরের সঙ্গে মিশে থাকে তার সংলাপ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, মানসিক গড়ন এবং সামাজিক পরিচয়। কাজেই তিনি যখন বলেন, দস্তয়েভস্কির উপন্যাসের চরিত্রগুলো বহুস্বরিক, তখন বয়ানকারী চরিত্রটির সংলাপ, চিন্তা, মনোভঙ্গি ও ধারণার মধ্য দিয়ে রূপায়িত দৃশ্যরাজিতে উপস্থিত এক বা একাধিক চরিত্রের পৃথক অস্তিত্ব পাঠকের চিন্তালোকে হাজির হয়। (সম্রাট, ২০১০ : ২৬) সেখানে একক কোনো স্বরের উপস্থিতিই প্রাধান্য পায় না, এমনকি কথক বা বয়ানকারীর স্বরটিও নয়। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, বহুস্বরিকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে যেখানে ব্যক্তিমানুষের প্রাধান্য (হামীম, ২০১৪ : ১৬১), সেখানে এ গল্পে আমরা সমষ্টিমানুষ বা গল্পকথকদের ভূমিকা পালন করতে দেখি।

> পঁচিশ নম্বর বাড়ির মামুনের কথা আমরা শুনতে পাই, সে খুব ভালো একটি কাজ করে, আমরা জানতে পারি যে, সে তরমুজওয়ালার কাছে গিয়ে বলে, মিয়া ভেজাল দেওয়া তরমুজ লয়া আহো ক্যালা, কিন্তু তরমুজওয়ালা তার কথা বুঝতে পারে না, আমরা যখন শুনি আমাদের প্রথমে মনে হয় যে, তরমুজওয়ালা আসলেই কথা বুঝতে পারে নাই, তরমুজওয়ালারা বোকা হয়, কারণ তা না হলে তারা তরমুজ বিক্রি করত না, আমাদের মতো কিনে খেত; কিন্তু পরে আমাদের মনে হয় যে, তরমুজওয়ালাই আসলে চালাক, সে তরমুজ না খেয়ে পয়সা জমায় এবং মামুনের কথা শুনে সে ইচ্ছে করে না বোঝার ভান করে, কি কন আপনে? কিন্তু মামুন যখন ব্যাপারটা পুনরায় বুঝিয়ে বলে, সে হাসে এবং আমরা তার বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হই, সে তরমুজের একটা ছোট টুকরা কেটে নিয়ে মামুনের গায়ের সাদা শার্টের নিচের প্রান্তে ঘষে দিলে কাপড়টা লাল হয়ে যায় এবং মামুন বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলে, এই রং আইলো কইথন, মিয়া আবার কও রং দেও না! কিন্তু ঘটনার তখনও বাকি ছিল, তরমুজওয়ালা তখন কাছের দেয়ালের গা থেকে এক চিমটি শেওলা তুলে নিয়ে মামুনের শার্টে ঘষে দেয় এবং সাদা শার্টে লাল দাগের পাশে সবুজ রঙের একটি দাগ হয়ে যায়, এবং সে বলে, এ্যালা? তখন মামুনের কিছু বলার থাকে না; আমরা যখন এই গল্প শুনতে পাই, (শহীদুল, ২০০৭ : ১৩৫)

এ উদ্ধৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, বহুস্বরের উপস্থিতি একে আড্ডাস্থলে পরিণত করেছে। প্রথমত, গল্পকথকদের সমন্বিত স্মৃতিচারণায় স্বগতোক্তির মাধ্যমে এ আলাপ পাঠকের নিকট উপস্থাপিত হয়। ফলে পাঠকের সঙ্গে তাদের পরোক্ষ কথোপকথন চলে। এরই মধ্যবর্তী পর্যায়ে গল্পের সূত্র ধরে হাজির হয় আলাপকারী অন্য চরিত্রগুলো। উদ্ধৃতির প্রথম বাক্যাংশে গল্পকথকেরা মামুনের যে বৃত্তান্ত পরিবেশন করে পাঠকের কাছে, সে কাহিনির বিবৃতিদাতা হিসেবে তাদের একটি পৃথক কণ্ঠ রয়েছে। কারণ এ কাহিনি সংঘটনের সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত ছিল না। তারা এ কাহিনি শুনেছে অন্য কারো কাছ থেকে। সেই অন্য স্বরটি পাঠক শুনতে পায় না। গল্পকথকেরা কাহিনিটি শুনলেও পাঠকের নিকট তা একবারে উপস্থাপন করে না। টুকরো টুকরো বর্ণনার মধ্যে তাদের নিজেদের ভাবনা মিশে যায়, এর সমান্তরালে মূল কাহিনির প্রধান দুই চরিত্র মামুন ও তরমুজওয়ালার বিবাদ চলতে থাকে। মামুনের প্রতি গল্পকথকদের পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও তরমুজওয়ালার কৌশলী ভূমিকার ফলে সম্পূর্ণ পরিস্থিতি বদলে যায়। সেকারণে শুধু মামুন নয়, গল্পকথকদেরও কাহিনির পরিণতিতে হতাশ হতে হয়। মামুন ও তরমুজওয়ালার পৃথক স্বর যেখানে ভাষ্যরূপ পেয়েছে পুরাতন ঢাকার

আমজনতার কথোপকথনের নিজস্ব ভাষায়, সেখানে গল্পকথকদের স্বগতোক্তির ভাষা শিষ্ট প্রমিত বাংলা গদ্যরীতির অনুসারী। এতে লুকিয়ে থাকে লেখকের নিজস্ব কণ্ঠস্বর, যেখানে শিক্ষিত মানুষের ভদ্রজনোচিত বাগবিন্যাস এবং সতর্ক ভঙ্গিতে পরিপাটিভাবে আলাপের প্রতিপাদ্যকে গুছিয়ে বলার পরিশীলন লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য, এ দুই পৃথক ভাষিক পরিমণ্ডলও গল্পের লেখক ও কুশীলবদের পাঠকের নিকট উপস্থিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে।

গণমানুষের অবাধ অংশগ্রহণে কার্নিভালের উৎসবমুখরতা ছড়িয়ে পড়ে এবং হাসি, ঠাট্টা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, দৈহিক অঙ্গভঙ্গি ও নাচ-গান, কৌতুক, টিপ্পনির সমাবেশে উড়িয়ে দেয় শাসকগোষ্ঠীর নীতি-নিয়মের প্রাচীর, অনুশাসনের শৃঙ্খল। গুরুত্বপূর্ণ ও রাশভারী ভাবনাকে হালকা চালে, লঘু মেজাজে উপস্থাপনে এসব উপাদানের প্রয়োগ উত্তরাধুনিক সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্ব পায়। এ গল্পে গল্পকথকদের আড্ডা ও প্রাত্যহিক জীবনাচরণে বারবার প্রতিফলিত হয় কার্নিভালের আবহ —

> আমাদের স্ত্রীরা আলমগীর হোসেনের স্ত্রীর কাছ থেকে এই গল্প জানতে পারে; আলমগীর হোসেন তাদের সমিতির সভায় অথবা সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য বগুড়া যায়, তখন যাওয়ার পথে কোনো এক জায়গায়, সে বলতে পারে না কোন জায়গায়, বেড়া, উল্লাপাড়া বা শেরপুরের কাছে, বিস্তৃত মাঠে মাটিতে বিছানো খড়ের ওপর লতাগুল্মের মতো তরমুজ গাছ দেখে সে চিনতে পারে, কারণ বড় বড় ডিমের মতো সাদা তরমুজ মাঠ জুড়ে পড়ে ছিল, তখন সে দৃশ্যটি দেখতে পায়, একটি লোক, সম্ভবত কৃষক, রাস্তার দিকে পিছন ফিরে বসে পাছার কাপড় উদোম করে তরমুজ ক্ষেতের ভেতর মলত্যাগ করে; এই খবরে আমাদের মন খারাপ হয়, ... আমরা তরমুজ কিনে নিয়ে ঘরে ফিরি এবং এই ফল দেখে আমাদের স্ত্রীরা বমি করে ফেলে, ... আমরা আবার তরমুজওয়ালার কাছে যাই, গিয়ে বলি, গ্রামের মানুষ এমুন খবিশ ক্যালা, হালারা হোগা বাইর কইরা রাখে; এবং বাটি থেকে চারকোণা করে কাটা তরমুজ নিয়ে মুখে দিই, কিন্তু আমাদের স্ত্রীরা খায় না ... তখন তরমুজওয়ালা আমাদের এই সঙ্কট থেকে রক্ষা করে, সে বলে, সাবান দিয়া ধুইয়া খান, এবং আমরা বাংলা সাবানের একটা করে ফালি কিনে নিয়ে আসি এবং ... পুতুলের মতো টাইফয়েড জ্বরে আমাদেরও পা শুকিয়ে যেতে পারত, কিন্তু তা যায়নি, তখন এই আনন্দের কথা শুনে আমাদের স্ত্রীরা আমাদের সঙ্গে পুনরায় তরমুজ খেতে রাজি হয়। আমরা চাকরদের পাঠিয়ে বরফের কুঁচি কিনে আনি, বাটিতে টুকরো করা তরমুজের সঙ্গে বরফ মেশানোর পর আমরা যখন তা মুখে পুরে আমাদের স্ত্রীদের দিকে তাকাই তারা টু-ই-ওয়ানের রেডিওর বোতাম টিপে দিয়ে বলে, আচকা রেডিওতে আমিন ভাইয়ের প্রগ্রাম আছে, আমরা তখন একটি প্রলম্বিত বোঁ... ধ্বনি শুনি, এতে আমাদের বড় অস্থিরতা হয়, আমরা পুনরায় মহল্লার তরমুজওয়ালার কাছে যাই (শহীদুল ২০০৭ : ১৩৮-১৩৯)

এ উদ্ধৃতিতে পাঠককে উদ্দেশ্য করে গল্পকথকদের বয়ানে যে দ্বিবাচনিকতার সূত্রপাত, তা পরবর্তী পর্যায়ে বহুস্বরিক হয়ে ওঠে অন্যান্য চরিত্রের কণ্ঠস্বরের সম্মিলনে। গল্পকথকরা যে গল্পটি বিবৃত করেছে, তাতে লুকিয়ে রয়েছে কয়েকজনের কণ্ঠস্বর। এদের একজন আলমগীর হোসেন, আরেকজন তার স্ত্রী, অবশিষ্টজনেরা গল্পকথকদের স্ত্রী। তাদের কাছ থেকে গল্পকথকেরা কৃষকের গল্পটি শুনে তরমুজওয়ালার সঙ্গে এ প্রসঙ্গে আলাপ চালায়,

যেখানে গ্রামের অধিবাসী তথা কৃষকদের রুচিহীন আচরণ সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশিত। তরমুজ কিনে বাসায় গল্পকথকেরা ফিরলেও তাদের স্ত্রীদের এর প্রতি ঘৃণা প্রকাশের ফলে সমস্যার প্রতিকারের জন্য গল্পকথকদের আবার তরমুজওয়ালার শরণাপন্ন হওয়ার বাধ্যবাধকতা, প্রভৃতি ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। তবে সেসব পরিস্থিতির ব্যাপ্তি স্বল্পকালের। ফলে বক্তা ও শ্রোতার ভূমিকা বদলে যাওয়ার সমান্তরালে সময়ের পরিবর্তন, চরিত্রের মনস্তত্ত্ব ও ভাষিক প্রতিবেশের বদল অনবরত ঘটতে থাকে। উদ্ধৃতির শেষ পর্যায়ে লক্ষণীয়, গল্পটিকে ঘিরে গল্পকথক ও তাদের স্ত্রীদের আচরণও অবশেষে পরিবর্তিত হয়। ভদ্রজনোচিত শিষ্ট কথ্য গদ্যরীতির সঙ্গে পুরাতন ঢাকার স্থানিক বহুস্বরের আশ্রয়ে আড্ডা, হুল্লোড়, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও রসিকতার তির্যক ভঙ্গি মিলেমিশে গল্পে কার্নিভালের প্রমত্ততাকেই যেন ব্যঞ্জিত করে।

এ গল্পের ভাষিক পরিমণ্ডলে লিওতার বর্ণিত 'অবযুক্তি'-র প্রয়োগও লক্ষণীয়। তিনি *দি পোস্ট-মডার্ন কণ্ডিশন : এ রিপোর্ট অন নলেজ* গ্রন্থের চৌদ্দ নং পরিচ্ছেদে 'প্যারালজি'র যে ধারণা দিয়েছেন, তার বাংলা ভাষান্তর করা হয়েছে 'অবযুক্তি' (শামসুদ্দিন, ২০১৫ : ৭৬-৭৭)। 'অব' উপসর্গযোগে গঠিত এ ধারণাকে পরিভাষাগত কারণে কোনোভাবেই 'খারাপ যুক্তি' বা 'অপ্রাসঙ্গিক যুক্তি' অর্থে বিবেচনার সুযোগ নেই। লিওতার এ ধারণার মধ্য দিয়ে সামাজিক মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ সাধনের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি 'অবযুক্তি'-সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন বৈধকরণের প্রসঙ্গে। কম্পিউটারাইজড সমাজে জ্ঞানকে কেন এবং কীভাবে বৈধ করা হয়, কারা এ ভূমিকা পালন করে, তারই বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে সমগ্র প্রতিবেদনটিতে। তিনি, মনে করেন, কোনো ভাবনা বা ধারণাকে বৈধকরণের নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তিনি বিকল্প বৈধকরণ নীতিকে প্যারালজি বা 'অবযুক্তি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১৬]

> মহল্লায় গরম পড়তে শুরু করলে চৈত্র, বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে তরমুজওয়ালারা তরমুজ নিয়ে আসে এবং আমরা তরমুজ খেতে শুরু করি ... আমরা তাদেরকে বলি, তুমরা এই মাছির দিনে তরমুজ লয়া আহ ক্যালা! ...আমরা তখন তরমুজওয়ালাদের কাছে জানতে চাই, তরমুজ দুই রকমের কেন হয়; কারণ আমাদের সামনে তরমুজ নির্বাচনের এক সঙ্কট উপস্থিত হয়, যা আমাদের পিতাদের ছিল না, তরমুজ তখন, সে সময় এক রকমের ছিল; তারা এরকম বলেন, যেমন আমরা বলি, গরম পড়তে শুরু করলে তরমুজওয়ালারা তরমুজ নিয়ে আসে, তখন মহল্লায় মাছি বেড়ে যায় এবং আমরা তরমুজওয়ালাদের বলি, মিয়ারা মাছির দিনে তরমুজ লয়া আহ ক্যালা! ... তরমুজ সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি ... আমরা তরমুজের সঙ্গে অনেক বিচি খেয়ে ফেলি, সেজন্য, অথবা বেশি পরিমাণে তরমুজ খাওয়ার কারণে আমাদের পেটের ভেতরটা মোচড় দেয়, আমরা তরমুজওয়ালার কাছে যাই এবং বলি তরমুজের বিচি হয় ক্যালা! (শহীদুল, ২০০৭ : ১২৯-১৩০)

এ উদ্ধৃতিতে গল্পকথকদের সঙ্গে মহল্লার তরমুজওয়ালাদের আলাপের পরিসর সৃষ্টি হয় তরমুজকে ঘিরে। এ কথোপকথন নিছক ক্রেতা-বিক্রেতার দর-কষাকষিমূলক আলাপ নয়। অপ্রাসঙ্গিক অথচ অন্তরঙ্গভাবে আলাপের আবহ এ উদ্ধৃতিতে লক্ষণীয়। তরমুজওয়ালারা যেহেতু এ মহল্লায় দীর্ঘদিন ধরে তরমুজ বিক্রি করে আসছে, সেকারণে তাদের নিকট থেকে

তরমুজের বৃত্তান্ত জানার সুযোগ সৃষ্টি হয় বলেই আলাপের খাতিরে গল্পকথকেরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। তাদের পিতাদের সময়ে তরমুজ কেনা ও খাওয়ার সঙ্গে বর্তমান সময়ের প্রভেদ এবং এ-সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যাদি হয়ে ওঠে আলাপের প্রতিপাদ্য। নিছক কেজো বাক্যালাপের গণ্ডিতে এ কথোপকথন সীমাবদ্ধ না থেকে বরং বাহুল্য সত্ত্বেও ভাবের আদানপ্রদান এ উদ্ধৃতিতে লক্ষণীয়। গল্পকথকদের জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে তরমুজওয়ালাদের সংযমী আচরণ আলাপ সম্প্রসারণের সুযোগ কমিয়ে দিলেও তাদের বারবার তরমুজওয়ালার দোকানে উপস্থিত হয়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে প্রশ্ন করার প্রবণতা পুরাতন ঢাকার জনজীবনের বাকপ্রিয়তার ইঙ্গিতবহ।

'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস' গল্পে শহীদুল জহির সচেতনভাবেই উত্তরাধুনিক ছোটগল্পের প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। *পারাপার* গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলোর সঙ্গে এর প্রতিতুলনা করলে লেখক হিসেবে তাঁর শিল্পিমানসে সন্নিহিত নিরীক্ষাপ্রিয়তার স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। তবে, শুধু এ গল্পেই তিনি যে উত্তরাধুনিক ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহকে অবলম্বন করে পুনরায় বাংলা ছোটগল্পের প্রচলিত পথে অগ্রসর হয়েছেন, ব্যাপারটি তেমন নয়। বরং এর পরবর্তীকালে রচিত ছোটগল্পসমূহেও উত্তরাধুনিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে চিহ্নিত করা যায়। তবে সেসব বৈশিষ্ট্য এ গল্পের মতো এত ব্যাপকভাবে তাঁর অন্য কোনো গল্পে অনুপস্থিত। সম্ভবত এসব কারণেই তিনি সাক্ষাৎকারে তাঁর রচিত উত্তরাধুনিক ছোটগল্পের নিদর্শন হিসেবে এ গল্পের নাম প্রস্তাব করেছেন। উত্তরকালের গল্পকারদের নিকট শহীদুল জহির যে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে অনন্যসাধারণ অবস্থানে বহুকাল অধিষ্ঠিত থাকবেন, এ গল্পটি সেই প্রত্যাশারই সাক্ষ্যবহ।

টীকা

১. লেখকের অভিমত —

বর্তমানে এসে গল্প বলার যে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে তা হলো, কতটুকু বলব, কীভাবে বলব, অথবা কতটুকু বলব না এবং কীভাবে বলব না। উত্তর আধুনিক গল্পের যে কায়দা তাতে গল্প হচ্ছে মাল্টি ফোকাসড, মাল্টি লেয়ারড, এর কাহিনীকে ধারাবাহিক পরিণতিতে নিয়ে না গিয়ে মাঝখানে কোথাও ছেড়ে দেয়া হয়- ... মাল্টি ফোকাসড হওয়া ইত্যাদি উত্তর-আধুনিক গল্পে শুধু কাঠামোগত দিক, আমি যতদূর জানি, উত্তর-আধুনিকতার আরো অনেক প্রসঙ্গ আছে। (রাশিদ, ২০১০ : ৬০৩-৬০৪)

২. লেখকের অভিমত —

মামুন হুসাইনের গল্প বেশ ভালো, আমার মনে হয় তিনি পোস্টমডার্ন গল্প চমৎকার লিখে থাকেন। ... বিভিন্ন প্রবন্ধ পড়ে আমি জানতে পারছি যে, সাহিত্য ধারায় পোস্টমডার্ন বা উত্তর-আধুনিক নামের একটা ধারা আছে। এই ধারার রচনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গল্পে ডেফিনিট কোনো গল্প না থাকা, সবকিছু অসংবদ্ধ বা তরল হবে, গল্পে একটা নির্দিষ্ট ফোকাস থাকবে না, ইনডেফিনিট হবে ইত্যাদি। মামুনের গল্পে আমি এগুলা দেখি। (রাশিদ, ২০১০ : ৫৮৬)

৩. তাপস মিত্রের অভিমত —

পোস্টমডার্ন ছোটগল্পের বয়ান ঘাসের মতো রাইজোম্যাটিক, মুক্ত, ইন্টারলকড, ... ঘাস যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে ইতি-ইতি সর্বত্র ছড়িয়ে যায়, ... তার প্লট বিকেন্দ্রিত, মুক্তিসোপান-ভাঙা। রচনার শিরোনাম বহুস্বরিক। ন্যারেটিভের চলন আধুনিকতাবাদী পাঠকের অপ্রীতিকর মনে হতে

পারে। আরম্ভসূত্র থেকে গল্পের উড়াল চতুর্দিকব্যাপী, যা উল্লম্বতা রৈখিকতাকে খর্ব করে। গল্পের চিন্তাতন্ত্র বহু অভিজ্ঞতা-প্রসূত, যা মুক্তসূচনা ও মুক্তসমাপ্তির পরিসরে খেলা করে। মুক্তসমাপ্তির দর্শন জিইয়ে রাখে সম্ভাবনাকে। (তাপস, ২০০৩ : ১২)

৪. লেখক জানিয়েছেন —
আমি একটু ভিন্ন কায়দায় লিখি ... ঘোর আমি তৈরি করি এবং সেটা পাঠককে সম্পৃক্ত করার জন্য করি। ... আমি পাঠকদের কাছ থেকে অনেক বেশি মনোযোগ দাবি করি। আমি অনেক ডিমান্ডিং, আমার লেখা পাঠকদের কাছে অনেক বেশি ডিমান্ড করে। আমার অনেক লেখায় আমি ঘোর তৈরি করে তার ভেতর মূল বিষয়টা ছেড়ে দিয়েছি। যেমন ধরেন, 'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস' ... গল্পে অনেক বড় একটা আবর্ত তৈরি করে তার মধ্যে আরেকটি গল্পকে ডুবিয়ে দেওয়া আছে। আমি চাই পাঠকরা সেই গল্পটিকে, সেই বিষয়টিকে খুঁজে নিক। (আবদুর, ২০১০ : ৫৯০)

৫. তাপস মিত্রের অভিমত —
পোস্টমডার্ন ছোটগল্পের সংজ্ঞাটিকে এইভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় ..."মুক্তসূচনা ও মুক্তসমাপ্তির বিকেন্দ্রিত, বহুউড়ালময়, রাইজোম্যাটিক, চিন্তাসংকর, যুক্তিক্রমভাঙা কথাসন্দর্ভ, যা প্রত্যক্ষগোচর ব্রহ্মাণ্ডবিশ্বে অবস্থিত প্রাণী ও অপ্রাণীর সত্তার বহুত্ব এবং সত্যের একাধিক্যকে বহুস্বরিক কাহিনিকণ্ঠে ক্ষুদ্র পরিসরে উপস্থাপন করে।" (তাপস, ২০০৩ : ১৩)

৬. এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন শহীদুল জহিরের পরবর্তীকালের (নব্বই দশকের) কথাশিল্পী ইমতিয়ার শামীম। (আবদুর, ২০১০ : ১৯৪)

৭. শহীদুল জহির এ গল্পের অনুবাদ করেছেন 'History of Our Cottage Industry' নামে। শুধু তাই নয়, ইংরেজি ভাষার পাঠকদের সুবিধার্থে তিনি গল্পটিতে ব্যবহৃত ছাব্বিশটি বাংলা শব্দের অর্থও সংযুক্ত করেছেন। (আবদুর, ২০১৩ : ৭৪৪-৭৬৫)

৮. জ্যাক দেরিদার 'ডিকনস্ট্রাকশন' পদবন্ধের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'বিনির্মাণ' বহুল প্রচলিত। এর আভিধানিক অর্থ 'ভাঙা' হলেও সম্প্রসারিত অর্থে 'পুনর্নির্মাণের জন্য ভাঙা' অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য অভিমত [হোসেন ও আলম, ২০০৬, *জ্যাক দেরিদা : পাঠ ও বিবেচনা*, পারভেজ হোসেন ও ফয়েজ আলম (সম্পাদিত), সংবেদ, ঢাকা, পৃ. ৩০]। পুরনো, গতানুগতিকের বিরুদ্ধে নতুনভাবে নির্মাণের প্রচেষ্টা বিনির্মাণের লক্ষ্য। দেরিদা *অফ গ্রামোটলজি* গ্রন্থে এর প্রস্তাবনা করলেও তাঁর কোনো লেখাতেই বিনির্মাণের কৌশল উপজীব্য হয়নি। তিনি ভাষার মধ্যে সন্নিহিত অধিবিদ্যাগত উপাদান ধ্বংস করার পাশাপাশি যে কোনো রচনায় (টেক্সট) অনুল্লেখিত বা অনুপস্থিত অর্থকে উদ্ধারের তাগিদে বিনির্মাণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

৯. বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভবের বৃত্তান্ত, এর বৈশিষ্ট্য এবং এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত জানতে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য : ক. রথীন্দ্রনাথ রায়, *ছোটগল্পের কথা*, সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ; খ. প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ; গ. সরোজমোহন মিত্র, *বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প*, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ; ঘ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *ছোটগল্পের সীমারেখা*, বাক-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।

১০. লেখকের অভিমত —
এই 'আমরা' মহল্লাবাসীই। এটা একধরনের কায়দা। এটা আমি করি, কারণ, এমন অনেক কিছুই বলা হয়, বা করা হয়, যেটা আমি পরে অস্বীকার করতে চাই—লেখক হিসাবে। 'তারা বলে' বা 'মহল্লাবাসী বলে' এই ধরনের বর্ণনা করলে অনেক ক্ষেত্রে আমি দায়টা তাদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারি। লেখক হিসেবে আমি সবকিছুর দায়িত্ব নিতে পারবো না জেনেই জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করি, সামষ্টিক আকারে বর্ণনা করি। ... এটা হচ্ছে একধরনের পদ্ধতি যেখানে বর্ণনা এবং কাহিনী তৈরির স্বাধীনতা নেয়া, জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করা বা জনশ্রুতিকে ব্যবহার করার যে সুবিধা, সেটাকে ব্যবহার করা। (আবদুর, ২০১০ : ৫৯৪)

১১. লেখক জানিয়েছেন —
জিনিসটাকে যদি আপনি একটা ছবি মনে করেন, তাহলে বলবো, ছবির আউটলাইনটাকে একদম ক্লিয়ার না করা, ফটোগ্রাফিক না করা, একটু ফাজি রাখা। অর্থাৎ ছবিটাকে আমি একটু ঝাঁপসা রাখতে চাই, একেবারে ক্লিয়ার করতে চাই না, ফটোগ্রাফিক ছবি করতে চাই না, ডিমার্কেশন লাইনটাকে অতো স্পষ্ট করতে চাই না। এটাই হয়তো আমার টেনডেনসি। (আবদুর, ২০১০ : ৫৯৬)

১২. শহীদুল জহির জাদুবাস্তবতার প্রয়োগ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন —
জাদুবাস্তবতার ... এই এক সুবিধা — টাইমফ্রেমকে ভেঙে দেয়া যায়। একটি ঘটনা একবারে না বলে, বারবার বলে, একটু একটু করে ডেভেলপ করা যায় মানে টুকরো টুকরো করে বর্ণনা করা, প্রতিটা টুকরোরই একটা বিশেষত্ব থাকতে পারে, সবগুলো টুকরো মিলিয়েই একটা পিস। ... জাদুবাস্তবতার ব্যাপারটা তো আমি মার্কেজের কাছ থেকে পেয়েছি। এবং এটা আমি গ্রহণ করেছি দুটো কারণে। প্রথমত, চিন্তার বা কল্পনার গ্রহণযোগ্যতার যে পরিধি সেটা অনেক বিস্তৃত হতে পারে বলে আমি মনে করি। পাঠকরা একটা সীমা পর্যন্ত নিতে রাজি আছে। মানে চিন্তাকে যদি আমি পুশ করি, কল্পনাকে যদি বিস্তৃত করি, তাহলে একটা সীমা পর্যন্ত তারা নেবে। এটাকে রূপকথা বানিয়ে ফেললে চলবে না, কিন্তু একইসঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক বর্ণনাভঙ্গির যে কাঠামো তার মধ্যে না থাকলেও চলে। দ্বিতীয়ত, আমি আসলে বর্ণনায় টাইমফ্রেমটাকে ভাঙতে চাচ্ছিলাম এবং সময়ের একতল থেকে অন্য তলে অনায়াসে যাতায়াত করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু ট্র্যাডিশনাল ধারায় আমি তা পারছিলাম না। আমার খুবই কষ্টকর ও ক্লান্তিকর মনে হচ্ছিল। মানে এইখানে শুরু করতে হবে, এইখানে শেষ করতে হবে—এইরকম আমার কাছে ক্লান্তিকর মনে হচ্ছিলো। তো মার্কেজের 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার অব সলিচ্যুড' পড়ে আমি দেখলাম, তিনি অনায়াসে সময়ের একতল থেকে আরেক তলে যাতায়াত করছেন। আমার সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই আমি জাদুবাস্তবতা ব্যবহার করতে শুরু করি, কারণ জাদুবাস্তবতায় এ সুযোগ আছে। (আবদুর, ২০১০ : ৫৯৬-৫৯৭)

১৩. লিওতারের অভিমত —
'এ হলো আলোকপর্বের আখ্যান, যাতে জ্ঞানের নায়ক এক শুভ নীতিগত-রাজনৈতিক সমাপ্তির দিকে কাজ করে থাকে–বিশ্বজনীন শান্তি। ... উত্তর-আধুনিকতাকে অধিআখ্যানের দিকে অবিশ্বাস হিসেবে সংজ্ঞায়িত করি। ... আখ্যানের কার্য তার কার্যকর্তাদের, এর মহা নায়ক, এর মহা বিপদ, এর মহা যাত্রা, এর মহা গন্তব্যকে হারাচ্ছে।' (শামসুদ্দিন, ২০১৫ : ২৩)

১৪. লেখক এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন —
'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস' গল্পটি একটিমাত্র অনুচ্ছেদে রচিত, অন্তিমে পূর্ণচ্ছেদসূচক-যতিহীন বিহীন বা খোলা। গল্পটা 'মাটি' নামক সাময়িকীতে এভাবেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এটাই শুদ্ধ পাঠ। এ বিষয়টি ছাড়া এই সঙ্কলনে গল্পটির আর কোন প্রকারের সংশোধন বা পরিমার্জনা করা হয় নাই। কেবলমাত্র একটি শুদ্ধ পাঠ নিশ্চিত করার জন্য গল্পটা পুনর্মুদ্রণ করা হলো। (শহীদুল, ২০০৮ : অনুক্রমণিকা, পৃষ্ঠাসংখ্যা অনুল্লেখিত)
এ প্রসঙ্গে শাহাদুজ্জামান জানিয়েছেন —
লেখার মধ্যে নানারকম নিরীক্ষা করেছেন শহীদুল। একই গল্পে একাধিক সম্ভাবনাকে জিইয়ে রেখে গল্পটিকে টেনে নিয়ে যান শহীদুল ... একটা নিরাবলম্ব অনিত্যতার মধ্যে তিনি ছুড়ে দেন আমাদের। একই বাক্য আর দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি করেন তিনি, পুনরাবৃত্তিকেই পরিণত করেন একটা শৈলীতে। আবার পাঠককে জালে জড়িয়ে ফেলবার জন্য প্রায়শই অতিদীর্ঘ বাক্য লেখেন শহীদুল। তার 'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস' গল্পটি একটি অনুচ্ছেদে লেখা। প্রায় ২০ পৃষ্ঠার একটি গল্পতে কোথাও কোন পূর্ণ যতি নেই, শুধু কমা আর সেমিকোলন দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন গল্প। গল্পটি শেষও হয়েছে একটি কমা দিয়ে। তিনি আমাকে বলেছিলেন ঐ মহল্লার জীবনের ভিসিয়াস

সাইকেলটাকে ধরবার জন্য অমনটি করেছিলেন। বলছিলেন *ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প* বইটিতে এই গল্প ছাপাবার সময় কিছুতেই ছাপাখানার মানুষদের ব্যাপারটা বোঝাতে পারছিলেন না। তিনি যতবার গল্পের শেষে দাড়ি কেটে কমা করেন, প্রুফ রিডার আবার সেটি দাড়ি করেন, বলেন, 'কমা দিয়ে লেখা শেষ হয় নাকি, আপনি ব্যাকরণ মানবেন না?' নিষেধ সত্ত্বেও তারা শেষে দাড়ি দিয়েই গল্পটি ছেপেছেন। শহীদুল একটি কমার বেদনায় মর্মাহত, বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। গল্পটির শুধু একটি শুদ্ধ পাঠ নিশ্চিত করবার জন্য তিনি কমা দিয়ে আবার এই গল্পটি ছাপান তার পরবর্তী বই *ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্পতে*। (আবদুর, ২০১০ : ১০৮)

১৫. দ্বিবাচনিকতা ও বহুস্বরিকতার উৎস সম্পর্কে জানতে দ্রষ্টব্য : হামীম কামরুল হক, 'বাখতিনের আখ্যানতত্ত্ব ও ইলিয়াসের খোয়াবনামা', (*সাহিত্য পত্রিকা*, বেগম আকতার কামাল (সম্পাদিত), বর্ষ : ৫২, সংখ্যা ১, কার্তিক ১৪২১, অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ১৬২-১৬৩)। দ্বিবাচনিকতা এবং বহুস্বরিকতা আধুনিককালের উপন্যাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তবু এসব ধারণা উত্তরাধুনিক সাহিত্যতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর কারণ সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত —

ধ্রুপদী বাস্তববাদী উপন্যাস সম্পর্কে আধুনিক পশ্চিমি আখ্যানতত্ত্বের অবস্থান মূলত জ্ঞানতাত্ত্বিক। এর প্রয়াস ছিল লেখকের সত্য বাচনিক (true-speaking) স্বরটির সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা। বাখতিনও লেখকের এই সত্য-বাচনের দাবিকে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু সেটি করেছেন সম্পূর্ণ অন্য একটি অবস্থান থেকে। বাচনিক স্তরবিন্যাস বা একবাচনিকতার বিরোধিতা তিনি চালিয়ে গেছেন একটি নৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষিত থেকে। এই একবাচনিকতার মধ্যে তিনি টের পেয়েছেন ক্ষমতার আস্ফালন আর সেই কারণেই তার একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক চরিত্র আছে। এই সূত্র (রাজনৈতিক পাঠ) ধরে এগোলে আখ্যানের অপর/বিকল্প স্বরের মূল্যায়নও অন্যরকম হওয়ার কথা। দস্তয়েভস্কি প্রসঙ্গে বাখতিন জানিয়েছেন যে একবাচনিকতার (monologism) বিকল্প হল বহুস্বরিকতা (polyphony)। এই বহুস্বরিকতার অর্থ শুধমাত্র বিকল্প স্বরের উদযাপন নয়, তার সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ সংযুক্তিও (engagement) বটে। (রণবীর, ২০১১ : ৬৮)

১৬. লিওতারের অভিমত —

অবযুক্তি হলো অর্থ সৃষ্টির চলমান প্রক্রিয়া। আপনি আমায় কিছু বললেন এবং তাতে প্রাণিত হয়ে আমিও জবাবে কিছু বললাম। এই সর্বসম্মতি হলো কথাবার্তার মধ্যে একটা স্তর। কথোপকথন আমাদেরকে তার চেয়ে মূল্যবান কিছু দিতে পারে। এ আমাদেরকে সংলাপের প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে পারে যা আমাদের উভয় অংশকেই চায়, এবং যখন তা সফল হয় তাতে নতুন ধারণার সীমাহীন প্রসারণে আমাদের মন জেগে উঠতে পারে। এই হলো প্যারালজি। (শামসুদ্দিন, ২০১৫ : ১২৬)

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

তপোধীর ভট্টাচার্য, ২০০৯। *বাখতিন*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

তাপস মিত্র, ২০০৩। 'পোস্টমডার্ন ছোটগল্পের সংজ্ঞার্থ', *হাওয়া ঊনপঞ্চাশ*, মুর্শিদ এ এম ও অরবিন্দ প্রধান (সম্পাদিত), পঞ্চবিংশ সংকলন, মাঘ ১৪০৯, কলকাতা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ। *ছোটগল্পের সীমারেখা*, বাক-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা।

প্রমথনাথ বিশী, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ। *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

পারভেজ হোসেন ও ফয়েজ আলম (সম্পাদিত), ২০০৬। *জ্যাক দেরিদা : পাঠ ও বিবেচনা*, সংবেদ, ঢাকা।

মুহম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), ২০০৭। *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (সম্পাদিত), ২০১০। *শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

২০১৩। *শহীদুল জহির সমগ্র*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

রণবীর লাহিড়ী, ২০১১। *আখ্যানতত্ত্বের আখ্যান*, চর্চাপদ, কলকাতা।

রথীন্দ্রনাথ রায়, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ। *ছোটগল্পের কথা*, সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

রাশিদ আসকারী, ২০০৩। *উত্তরাধুনিক সাহিত্য ও সমালোচনা তত্ত্ব*, ফ্রেন্ডস বুক কর্ণার, ঢাকা।

শহীদুল জহির, ২০০৭। *শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প*, সমাবেশ, ঢাকা।

২০০৮। *ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

শামসুদ্দিন চৌধুরী, ২০১৫। *উত্তর-আধুনিক পরিবেশ : জ্ঞানের সম্পর্কে একটি রিপোর্ট*, জঁ-ফ্রাঁসোয়া লিয়োতার, বর্ণায়ন, ঢাকা।

সম্রাট দত্ত, ২০১০। *বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

সরোজমোহন মিত্র, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ। *বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প*, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা।

সালাহউদ্দিন আইয়ুব, ১৯৯৯। *সংস্কৃতির জিজ্ঞাসা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হামীম কামরুল হক, ২০১৪। 'বাখতিনের আখ্যানতত্ত্ব ও ইলিয়াসের খোয়াবনামা', *সাহিত্য পত্রিকা*, বেগম আকতার কামাল (সম্পাদিত), বর্ষ ৫২, সংখ্যা ১, কার্তিক ১৪২১

Zillur Rahman Siddiqui (edited), 2002. *English-Bangla Dictionary*. Bangla Acadamy, Dhaka.

এ প্রবন্ধটি শহীদুল জহিরের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে 'শহীদুল জহির স্মৃতি পরিষদ' আয়োজিত সেমিনারে গত ০৭/০৪/২০১৫ তারিখে পঠিত হয়।